ঈদ সংখ্যা

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

৩য় বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

ঈদের দিনের সুন্নত ও মুস্তাহাবঃ

১. মেসওয়াক করা।

২. গোসল করা।

৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৪. কিছু খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া।

৫. ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া উত্তম। এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে আসা মুস্তাহাব।

৬. ঈদগাহে যাওয়ার পথে নিচু স্বরে তাকবির বলা।

৭. সাধ্যমতো উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

৮. ঈদগাহে যাওয়ার আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা। এটি ঈদের দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত।

৯. ঈদের দিনে চেহারায় হাসি-খুশি ভাব প্রকাশ করা, কারো সঙ্গে দেখা হলে আনন্দ বিনিময় করা। কোলাকুলি করা।

১০. আনন্দ-অভিবাদন বিনিময় করা।

(ফাতাওয়া শামি : ১/৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮; হেদায়া : ২/৭১; বুখারি : ১/১৩০, ইবনে মাজাহ : ৯২)

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

৩য় বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা | এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

মাসিক

নবীনকণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

ঈদ সংখ্যা

প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

উপদেষ্টা
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধায়ক
মুফতী মাসউদ আলিমী

প্রধান সম্পাদক
মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক
উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক
বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক
কাজী মা'রুফ
শামসুল আরেফীন

ব্যবস্থাপনায়
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের, মুফতী ইমদাদুল্লাহ,
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী, আনিসুর রহমান আফিফি,
মুফতী আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী, মুহা. সায়েম আহমাদ,
মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ, মুহা. হাছিব আর রহমান,
মুফতী ওলিউল্লাহ তাহসিন, হা. তাওসীফ আহমাদ,
কবি রাশেদ নাইব, তাশরীফ আহমদ,
জাবের মাহমুদ, মাও. হাবিব উল্লাহ,
জুবায়ের আহমেদ, মুফতী সাইফুল্লাহ,
হুসাইন আহমদ, মুহা. আব্দুর রশীদ।

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

যোগাযোগ
অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

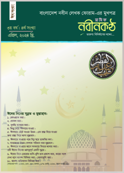

৩য় বর্ষ । ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল -২০২৪

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে 'নবীনকণ্ঠ' এবারের ঈদ সংখ্যায় যারা লিখেছেন:

লেখক সূচী

কুরআনের আলো

মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবায়ের

হাদীসের আলো

মুফতী ওমর ফারুক হানযালা

প্রবন্ধ

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মুফতী আইয়ুব নাদীম
আ. আজিজ বিন আ. মালেক
যোবায়ের মাহমুদ
ইসমাঈল সিদ্দিকী
মুফতী ফয়জুল্লাহ (সীতাকুণ্ড)
মিজান ইবনে মোবারক
মাও. ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী

স্মৃতিগদ্য

রফিকুল ইসলাম রিয়াদ
উবাইদুল্লাহ তারানগরী
ওমর ফারুক
আলী ওসমান শেফায়েত
মাসুমা সাঈদা

গুণিদের গুণালাপ

আব্দুল্লাহ আল মামুন আশরাফী

ইতিহাস

মারুফ হাসান

ছড়া/কবিতা

সায়রা নূর মারইয়াম, জুনাইদ বাশার, প্রহ্লাদ কুমার প্রভাস, রুশো আরভি নয়ন, রবিউল হাসান আরিফ, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, রুকাইয়া তাসনীম, এইচ. এম. মাহমুদুল হাছান, আবরার নাঈম, রাশেদ নাইব, মুহাম্মদ মুকুল মিয়া, আব্দুল আহাদ, গাজী আরিফ মান্নান, আলমগীর কবির, আবু ইউসুফ সুমন, মুহাম্মদ এমদাদুল হক, তামীম আহমদ সাদী, ইফতেখার জামান সাজারিয়া, মুহাম্মাদ ছিদ্দিকুর রহমান, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, জাহিদ বিন মোস্তফা, শামসুল আরেফীন

ভ্রমণকাহিনি

আশিকুল্লাহ মাহমুদ
দ্বিপ্রহর

গল্প

জিশান মাহমুদ, ছিদ্দিকুর রহমান
আমাতুল্লাহ ফাতেমা
জাকারিয়া জুবায়ের
মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন
ইয়াসিন আরাফাত
মুহাম্মাদ সাজিদ হাসান
আবু বকর আরাফাত
ইবনে আলাউদ্দিন

অনুভূতি

মোহাম্মদ লাবীব

মুক্তগদ্য

বেলাল বিন জামাল
মাহফুজ রুমান খান

রোযনামচা

জোবায়ের বিন মামুন
শিব্বির আহমদ
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
বাইজিদ আফনান
নাফিস ইকবাল নাফি
মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ

নবীন কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে ...

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ, বছর ঘুরে আবার এলো পবিত্র ঈদুল ফিতর। এক মাস সিয়াম সাধনার পর রোজাদারদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ নেয়ামত এই ঈদুল ফিতর। ঈদ মানে আনন্দ। ধর্মপ্রাণ মুসলমান সব ভেদাভেদ ভুলে পরস্পর মিলিত হয়ে এই আনন্দ উপভোগ করে। কেউ পরিবারের সাথে, কেউবা কর্মস্থলে, কেউবা প্রবাসে। সবার ঈদ-উৎসবকে আরও রাঙিয়ে তুলতে নবীনকণ্ঠ পরিবার এবার আয়োজন করেছে ঈদ সংখ্যার।

আলহামদুলিল্লাহ, দেখতে দেখতে নবীনকণ্ঠ'র ৪র্থ সংখ্যা চলছে। আপনাদের ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণায় অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে নবীনকণ্ঠ। আশা করি, এভাবে একদিন সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আপনাদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ব্যাপক সাড়া দিয়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য। দোয়া করবেন, যেন পিডিএফ নবীনকণ্ঠ খুব দ্রুতই প্রত্যেকের হাতে হাতে প্রিন্ট আকারে পৌঁছে দিতে পারি।

ঈদ যেহেতু সম্প্রীতির বার্তা ছড়ায়, ঐক্যের আহ্বান করে , আনন্দের বাণী শোনায়; তাই আমাদেরও খেয়াল করা উচিত-এই সম্প্রীতি, ঐক্য ও আনন্দ যেন আমাদের পরিবার, আপনজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সবাইকে একসাথে নিয়ে যেন আমরা এই খুশি ভাগাভাগি করতে পারি। এই খুশি ভাগাভাগি করার অন্যতম মাধ্যম হলো আমাদের জাকাতগুলো সঠিকভাবে আদায় করা। সাদকাতুল ফিতর আদায় করা। অথবা নিজের অর্থ থেকে প্রতিবেশী, আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যারা একটু সামান্য অর্থশূন্য আছে, তাদেরকে নতুন কাপড় ও ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে আমাদের এই আনন্দের বার্তা যেন অন্য মুসলিম দেশ বা নির্যাতিত মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করা। তার মধ্যে অন্যতম হলো ফিলিস্তিন গাজার নির্যাতিত অসহায় মুসলিমদের জন্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করা।
সেখানে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার চেষ্টা করা। এখন প্রায় জায়গা থেকেই গাজায় ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে। আমরা আমাদের বিশ্বস্ত মাধ্যমগুলোতে তাদের জন্য কিছু অর্থ পাঠানোর চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ । আমাদের মধ্যে যারা অর্থ পাঠাতে পারব না, তারা বিশেষভাবে দোয়া করতে পারি- আমাদের মুসলিম ভাইদের জন্য । তারা খুব অসহায় । নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাদের কষ্ট আমাদের মধ্যেও অনুভব করা। তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা, আল্লাহ যেন আমাদের মুসলিম ভাইদের বিজয় দান করেন, অমুসলিমদের ধ্বংস করেন। আমিন ইয়া-রব।

পরিশেষে বলতে চাই, নবীনকণ্ঠ পরিবার অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিরলসভাবে আপনাদের সামনে ঈদ সংখ্যা নিয়ে এসেছে। আমাদের এই কষ্ট তখন লাগব হবে, যখন আপনারা এই পত্রিকা পড়বেন এবং নিজ নিজ ফেসবুকে শেয়ার করবেন, বন্ধুদের জানাবেন। এতেই আমার সার্থক। কোরআন ও হাদিসের আলোকে ঈদুল ফিতরের ফজিলত, ঈদ সম্পর্কে গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও মুক্তগদ্যসহ আমরা এই সংখ্যায় এক বর্ণিল আয়োজন করার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

● মুফতী রহমতুল্লাহ জুবায়ের

ঈদুল ফিতর-আনন্দ উৎসবের দিন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: ‘রমজান মাস, তাতে কুরআন নাজিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত, সৎপথপ্রাপ্তির স্পষ্ট নিদর্শন ও হক বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের যে-কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই এ মাসের রোজা রাখে এবং কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে থাকলে, তাকে অন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা চান, তোমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে চান না এবং এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর যে, তিনি তোমাদের হেদায়েত করেছেন। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।’ (সুরা বাকারা: ১৮৫) উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশে ঈদের আনন্দ উৎসবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। রোজার বিধান যেমন আল্লাহ তাআলা দান করেছেন, তেমনই এর উপর আনন্দ ও শুকরিয়া আদায়ের শিক্ষাও আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন।

মূলত ঈদ মানে আনন্দ-উৎসব। এই আনন্দ-উৎসব উদ্‌যাপন করা এটা মানুষের স্বভাবের চাহিদা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষেরই ঈদ আছে। তবে মুসলমানদের ঈদুল ফিতরের পুরো আনন্দটি প্রাপ্তি ও পাওয়ার আনন্দ। যারা একমাস ধরে সিয়াম সাধনা করেছেন, তাদের জন্যই মূলত এই দিনটি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের দিন। আর যারা সিয়াম সাধনা করেনি, তাদের জন্য খুশির পরিবর্তে ধ্বংস অপেক্ষা করছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই কল্যাণকর বিধান ও নির্দেশনা লাভের উপর এবং সেই বিধান পালনের তাওফিকপ্রাপ্ত হওয়ার উপর আল্লাহ তাআলার শোকরগুজারি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ হলো ঈদুল ফিতরের আনন্দ।

সদকায়ে ফিতর-ত্রুটি দূর করে শুদ্ধি আনে:আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: ‘নিশ্চয় সফলকাম হবে সে, যে তার অন্তরাত্মাকে শুদ্ধ করে।’ (সুরা আলা: ১৪)

উক্ত আয়াতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক জাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো তাফসিরবিদ সরাসরি সদকায়ে ফিতর উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

মূলত ঈদকে সার্বজনীন করে তুলতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে সদকাতুল ফিতরের বিধান এসেছে। এজন্য ঈমানদার ব্যক্তিরা ক্ষমা প্রাপ্তির খুশিতে আর রমজানের কৃত আমলের ত্রুটি দূর করতে

সদকাতুল ফিতর আদায় করে এবং এতে প্রচণ্ড তৃপ্তিও অনুভব করে।

ঈদের নামাজ ও তাকবির রবের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'এবং তাঁরা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে। অতঃপর নামাজ আদায় করে।' (সুরা আলা: ১৫)

উক্ত আয়াতে বাহ্যত ফরজ ও নফল সব নামাজ অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ কেউ জিকির দ্বারা ঈদের তাকবির ও নামাজ দ্বারা ঈদের নামাজ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ঈদের নামাজের মাধ্যমে শুরু হয় ঈদের উৎসব আমেজ। এতে ধনী-গরিব, আমির-ফকির নির্বিশেষে সব মুসলমান এক কাতারে দাঁড়ায়। একসঙ্গে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ঘোষণা করে। পরস্পরে কুশল বিনিময় করে। নামাজ ও তাকবিরের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণকারীরাই সত্যিকার অর্থে সফলকাম এবং তাদের জন্যই ঈদুল ফিতরের প্রকৃত আনন্দ-উৎসব। আর মুমিনের আনন্দ-উৎসব আল্লাহর বড়ত্ব ও কর্তৃত্বকেই প্রকাশ করে। এজন্য মৌখিকভাবে 'আল্লাহু আকবার' তথা তাকবিরে তাশরিক বলা এই সময়ের একটি বিশেষ জিকির। সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিন ঈদের রাতে ও ঈদের সকালে তাকবির পাঠ করতেন। ঈদগাহে যাওয়ার সময়ও নিম্নস্বরে তাকবির বলা মুস্তাহাব। ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবির এবং ঈদের খুতবার তাকবিরগুলোও ঈদুল ফিতরের বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ সকল বিধান পালনের মাধ্যমে ইসলাম জগতের সকল মিথ্যা বড়ত্বের দাবিদারকে পরিত্যাগ করার চেতনাই শিক্ষা দেয় এবং আনন্দ প্রকাশের সকল কুসংস্কৃতি ও বেহায়াপনার প্রতি কঠিনভাবে নিরুৎসাহিত করে।

সর্বশেষ মিনতি, রমজানের বরকত লাভের জন্য ত্যাগ কষ্ট-ক্লেশ ও সাধনার পর বহুল প্রতীক্ষিত ঈদুল ফিতর আমাদের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি। আমিন।

লেখক: শিক্ষাসচিব, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ সাভার, ঢাকা

হাদিসের আলোকে পবিত্র ঈদুল ফিতর দিনে করণীয় ও বর্জনীয়

★ মুফতি ওমর ফারুক হানযালা

ঈদ আরবি শব্দ। ঈদ শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। তার মধ্যে একটি অর্থ হলো খুশি বা আনন্দ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসলমানদেরকে বছরান্তে দুটি দিবস ঈদ হিসেবে দান করেছেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। এ দুটি দিবসই অত্যন্ত মর্যাদাশীল, আনন্দ ও খুশির দিন। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম উম্মাহর জন্য খুশির সওগাত নিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত ঈদ। ঈদ খুশির, ঈদ আনন্দের, ঈদ ক্ষমার, সব ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে বুকে জড়ানোর দিনই হলো ঈদ।

শরিয়তে যেভাবে ঈদের প্রচলন শুরু হয়: আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বীয় বান্দাদেরকে বছরান্তে দুটি ঈদ দান করেছেন। তা একমাত্র তাঁর নেয়ামতই বটে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরিফ হতে হিজরত করে যখন মদিনা শরিফ পৌঁছলেন, তখন মদিনাবাসীদেরকে 'নওরোজ' ও 'মেহেরজান' নামে বছরান্তে দুটি আনন্দ-দিবস উদ্‌যাপন করতে দেখলেন, যে দিবসগুলোতে তারা শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তি করে। হজরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন: আমরা জাহেলি যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন তিনি বললেন: 'আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ দু'দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'টি দিন দিয়েছেন। তা হলো ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর। (সুনানে আবু দাউদ: ১১৩৪)

ইসলামি দিকনির্দেশনা অনুযায়ী যদি আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করি, তবে একদিকে যেমন ঈদের অনাবিল আনন্দে ভরে উঠবে আমাদের পার্থিব জীবন, অন্যদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে আমাদের পরকালীন জিন্দেগি। পবিত্র দিবসে ইসলামি দিকনির্দেশনার প্রতি লক্ষ রেখে যে বিষয়গুলো আমাদের করণীয়:

ঈদের দিন গোসল করা: ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। (সুনানে বায়হাকি: ৫৯২০)

নতুন বা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা: ঈদে উত্তম জামা-কাপড় পরিধান করে ঈদ উদ্‌যাপন করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নিয়ামাতের প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন। (আল জামেউস সহিহ: ১৮৮৭)

পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া: হজরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুন্নাত হলো ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া। (সুনানে তিরমিজি: ৫৩৩)**যে পথে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসা:** নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে পথ বিপরীত করতেন। (সহিহ বুখারি: ৯৮৬)

তাকবির পাঠ করা: তাকবির পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়।

তাকবির হলো: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। বাক্যটি উচ্চৈঃস্বরে পড়া। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবির পাঠ করতেন। (মুসতাদরাক: ১১০৬)

ঈদের নামাজ আদায় করা: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে বের হয়ে দু'রাকাত ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। এর পূর্বে ও পরে অন্য কোনো নামাজ আদায় করেননি। (সহিহ বুখারি: ৯৮৯)

ঈদ উপলক্ষ্যে পরস্পরে শুভেচ্ছা বিনিময় করা: মুসলমানগণ পরস্পরে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করাতে অসুবিধা নেই। কারণ সাহাবিগণ রাযি. ঈদ উপলক্ষ্যে তা করতেন। তারা এই বলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতেন:

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম' অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের (ইবাদত-বন্দেগি) কবুল করুন। (বায়হাকি: ২/৩১৯)

ফিতরা দেওয়া: রমজান মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণার্থে অভাবগ্রস্তদের ফিতরা প্রদান করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি: ১৫০৩)

ঈদ মুসলিম জাতির গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব। মুসলিম হিসেবে আমাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি রয়েছে। সে সংস্কৃতি হতে হবে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস সমর্থিত। ঈদ পালনে ইসলাম সমর্থন করে না এমন সব বিনোদন বা সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত হওয়া খুবই গর্হিত কাজ। মুসলিম হিসেবে তা আমাদের বর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈদ উদ্‌যাপনের নামে বিজাতীয় আচরণ মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে অমুসলিমদের অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে মুসলমানদের অনেকেই। আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। (সুনানে আবু দাউদ: ৪০৩৩)

ঈদ উৎসবের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা তার ধর্মীয়-জীবনের এবং সমাজ-জীবনের বহিঃপ্রকাশ, সাম্য মৈত্রীর সন্ধান লাভ করে। বিশ্ব মুসলমানের জীবনে রামজান যেমন আত্মশুদ্ধি ও সাম্যের বার্তা নিয়ে হাজির হয়, ঠিক তেমনই ঈদ বয়ে আনে সাম্য-মৈত্রী-সম্প্রতির সুমহান বার্তা। ঈদ হোক আমাদের জীবনের নিত্যসাথী।

লেখক, মুফতি ও মুহাদ্দিস, জামিআ হোসাইনিয়া, তজুমদ্দিন, ভোলা।

সাদকাতুল ফিতরঃ পরিমাণ ও আদায় করার সময়

মুফতি রফীকুল ইসলাম আল মাদানী

সদকাতুল ফিতর বা ফিতরা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স.থেকে বর্ণিত হাদীসের সারমর্ম হল যব, কিসমিস ,খেজুর ও পনির ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এবং আটা , গম ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম আদায় করা তিনি ধার্য করেছেন । (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কিছু লোক বলে থাকে হাদীসের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য উল্লেখ করা হয়েছে তা-ই ফিতরা হিসেবে আদায় করতে হবে। এর মূল্য বা টাকা পয়সা ফিতরা হিসেবে আদায় করা যাবে না । অথচ রাসূলুল্লাহ স. সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে হাদীসে উল্লেখিত জিনিস দ্বারা যেভাবে ফিতরা আদায় করা যাবে এগুলোর সমমূল্য আদায় করা হলেও ফিতরা আদায় হবে। বরং মানুষের জন্য সহজ এবং তাদের প্রয়োজন সমাধানের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করা আরো শ্রেষ্ঠতম বলে বিবেচিত ।

কারণ অসহায় লোকজনের খাদ্যদ্রব্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় না। বরং তারা টাকা হলে খাদ্যদ্রব্য অথবা অন্য যেকোনো প্রয়োজনীয় জিনিস সহজে ক্রয় করতে পারে । অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তারা অনেক কম মূল্যে বিক্রি করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। যার ফলে তারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ইমাম বুখারী উমর ইবনে আব্দুল আজিজ হাসান বসরী এবং আরবের প্রখ্যাত গবেষক ইবনে তাইমিয়া ও ইউসুফ আল কারযায়ীর মতামত। (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৮ মাজমুউল ফাতাওয়া২৫/৭৯ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৩৮ -৪-৩৭ বাদাইউস সানায়ী ২/৭২)

যারা মূল্য আদায় করা যাবে না বা টাকা দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে না বলে তারা বর্তমানে চাউল দিয়ে ফিতরা আদায় করে থাকে। আমি তাদেরকে বলতে চাই হাদীসে যব,কিসমিস, খেজুর, পনির, আটা ও গম দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করার কথা উল্লেখ আছে। অতএব যারা চাউল দিয়ে সদকাতুল ফিতর আদায় করে যাচ্ছে হাদীস অনুযায়ী তাদের সদকাতুল ফিতর আদায় হয় না। বরং তারাও কিআছ এবং অনুমানের ভিত্তিতে আদায় করে যাচ্ছে। অতএব মানুষের জন্য সহজ সাধ্য হয় সেদিকে চিন্তা করা ইসলামী ফিক্বহের একটি মূল ভিত্তি ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা। আর মানুষের জন্য সহজসাধ্য হল মূল্য ও টাকা। দাতার জন্যও সহজ গ্রহীতার জন্যও সহজ। তাই চাউল দিয়ে ফিতরা আদায় করা বৈধ হলে টাকার

মাধ্যমে ফিতরা আদায় করা সর্বাপেক্ষা উত্তমভাবে আদায় হবে।

যারা বলে মূল্য আদায় করা যাবে না তাদের সুস্পষ্ট কোনো দলীল নেই। তাদের কথা হলো হাদীসের মধ্যে এ সমস্ত জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে এজন্যই এই জিনিসগুলো আদায় করতে হবে। কিন্তু হাদীসে এই জিনিস গুলোর মূল্য আদায় করা যাবে না তাও কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি । সবচাইতে যুক্তি সঙ্গত বিষয় হলো, তদানীন্তন কালে মুদ্রা ছিল দুই ধরনের । এক ধরনের মুদ্রার নাম দিনার যা ৪.৫ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ।এই পরিমাণ স্বর্ণের মাধ্যমে দুইটি খাসি কেনা যেত। দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রা ছিল দিরহাম যা ২. ৯৭৫ গ্রাম রুপা পরিমাণ ।১০ দিরহাম দ্বারা একটি খাসি ক্রয় করা যেত । ভাঙতি কোন মুদ্রা তখন ছিল না। অতএব সদকাতুল ফিতর এর পরিমাণের তুলনায় ডিনার এবং দিরহাম অনেক বেশি । যে কারণে দিনার এবং দিরহাম দিয়ে সদকাতুল ফিতর দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব বা যুক্তি সঙ্গত ছিল না। এছাড়া আরো সুস্পষ্ট কয়েকটি দলীলের ভিত্তিতে বিজ্ঞ গবেষকগণের মতামত হলো: হাদীসে উল্লেখিত জিনিস এবং এগুলোর সমমূল্য উভয় পদ্ধতিতে ফিতরা আদায় করা যাবে।

১ .ইমাম বুখারী একটি অধ্যায়ের নাম করেছেন

باب العرض في الزكاة

যাকাত হিসেবে কোনো জিনিস আদায় করা সম্পর্কিত অধ্যায়। সেখানে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন, মায়াজ র. ইয়েমেন বাসীদের বলেন, যব ভুট্টার পরিবর্তে আমার নিকট ছোট পরিহিত কাপড় প্রদান করো। বুখারী হা. ১৪৬৮ ইবনে হাজার বলেন তালীক সহীহ। (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৮)

২. মহানবী স. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, তিনি মহিলাদের বলেন

تصدقن ولو من حليكن

তোমরা সাদকা (যাকাত ফিতরা) আদায় করো যদিও তোমাদের অলংকার হয়। (সহীহ বুখারী হা. ৯৭৭ ০) এখানে তিনি খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য জিনিস দ্বারা যাকাত ফিতরা আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন ।

৪ . সহীহ বুখারি আনাস র. থেকে বর্ণিত বিস্তারিত হাদীসের সারমর্ম , যাকাতের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়সের পশু আদায় করা সম্ভব না হলে যদি ছোট পশু আদায় করে সাথে ২০ দিরহাম অথবা সমমূল্যের দুটি ছাগল আদায় করবে । বড় পশু আদায় করা হলে যাকাত উসলকারি ২০ দিরহাম বা সমমূল্যের দুটি ছাগল ফেরত দিবে। সহীহ বুখারি ২/৮ ২ বাইতুল আফকার।

এতেও মূল্য নির্ধারণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৫. সাহাবাগণ র.থেকে বর্ণিত বেশ কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায় দ্রব্যের পরিবর্তে মূল্য হিসেবে ফিতরা আদায় করা যাবে। ইমাম ইবনে আবী শাইবা তার প্রসিদ্ধ কিতাবে এ বিষয়ে একটি শিরোনাম করেন।

باب اخراج الدراهم في زكاة الفطر

এতে তিনি উল্লেখ করেছেন

ক. উমর ইবনে আবদুল আজিজ প্রখ্যাত তাবেয়ি আদীর নিকট লিখেন সদকায়ে ফিতর অর্ধ দিরহাম গ্রহণ করো। (ইবনে আবী শাইবা ৬/৫০৭ হা.১০৪ ৬৯)

খ. তাবেয়ি কুররা বলেন ,আমাদের কাছে উমর ইবনে আবদুল আজীজের নির্দেশ আসে অর্ধ ছা, অথবা এর মূল্য হিসাবে ফিতরা গ্রহণ করার জন্য । প্রাগুক্ত

গ. প্রসিদ্ধ তাবেয়ি আবু ইসহাক বলেন. আমরা সাহাবাগণ র. কে খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় করতে পেয়েছি। (প্রাগুক্ত)

সাহাবাগণ র.খেজুর ও যবের পরিবর্তে এসবের সমমূল্যের গম দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। মায়াবিয়া রা. এমন করতেন বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। (সহীহ বুখারি হা.১৫০৮)

ফিতরার সমতুল্য আরেকটি বিষয় হলো যাকাত। কোনো ধরনের মতভেদ ছাড়াই নগদ টাকা দিয়ে যে কোন দ্রব্যের যাকাত আদায় করা যায়। অতএব ফিতরাও এভাবেই নগদ টাকা দিয়ে আদায় করা যাবে।

সাহাবাগণ র. থেকে এ মর্মে ১২ টিরও বেশি সহীহ হাদীস রয়েছে। মুরসাল মাওকুফ হাদীস তো অসংখ্য ।বিস্তারিত জানার জন্য পড়েন

تحقيق الآمال في اخراج صدقة الفطر بالمال

সংশয় :

কউ কেউ বলে থাকে হাদীসে যে বিষয়গুলো উল্লেখ হয়েছে সেগুলো প্রধান খাবার হিসেবে । কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাবে যারা বর্তমানে চাউল প্রদান করে । কেননা আরবে চাউল প্রধান খাবার নয় । এছাড়া প্রধান খাবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম । সমাজ দেশ পরিবার ব্যক্তি হিসেবে প্রধান খাবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : মূর্খ লোক প্রশ্ন করে থাকে রাসূলুল্লাহ স.কেন দিনার দিরহাম দ্বারা ফিতরা আদায় করেন নি?

উত্তর :

একটি উত্তর এমনও হতে পারে রাসূল স.এর যুগে চাউল ছিল তার পরেও তিনি চাউল দিয়ে ফিতরা দেননি । যে কারণে চাউল দ্বারা ফিতরা দেননি ওইভাবেই দিনার দিরহাম দিয়ে ফিতরা দেননি। অতএব যারা চাউল দিয়ে ফিতরা দিচ্ছে তাদেরকেই বলতে হবে দিনার দিরহাম দিয়ে রাসূল স. ফিতরা কেন আদায় করেন নি।

অন্যতম একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ডিনার হল ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ (বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার টাকা পরিমাণ) এবং দিরহাম হল ৩ . ০ ৬১৮ গ্রাম রুপা (বর্তমানে চার শত টাকা পরিমাণ) যা সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ থেকে অনেক বেশি । অতএব দিনার দিরহাম দ্বারা সদকাতুল ফিতরা আদায় করা সম্ভবই ছিলনা ।

আর খেজুর পনির গম আটা যব সাধারণ খাদ্য হওয়ায় তখন এর মূল্য ছিল অনেক কম । বিশেষ করে খেজুর তখনকার যুগে খুবই সস্তা ছিল। এই জন্য সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ গম এবং আঠা ইত্যাদি

দ্বারা আদায় করার নির্দেশ করেছেন। যে পরিমাণে আদায় করা প্রত্যেকের জন্য সহজ ছিল এবং বোঝাও সহজ ছিল। মনে করেন আপনার কাছে ১০০০ টাকার নোট আছে ভাঙতি কোন টাকার ব্যবস্থা নেই। তখন আপনি ৭৫ টাকা ফিতরা আদায় করা সম্ভব হবে না । নিরুপায় হয়ে অন্য কোন জিনিস দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে।

সাদকাতুল ফিতর আদায় করার সময়:

যে মুসলমান ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিক তথা সাহারির সময় শেষ হওয়ার পর নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ও ঋণ পরিশোধের অর্থ ব্যতীত, যাকাতের নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে তার পক্ষ থেকে এবং তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। বরং তারা সামর্থ্যবান হলে তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে নিজেরাই আদায় করতে হবে। তবে অভিভাবক হিসেবে যদি আদায় করে দেন তাহলে আদায় হয়ে যাবে।

সাদকাতুল ফিতর হানাফী মাযহাব অনুসারে ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর পর ওয়াজিব হয়। তবে পুরো রমজান মাস ব্যাপী সদকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে। অবশ্য ঈদ পূর্ববর্তী ২/১ দিনের মধ্যে এবং ঈদের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর থেকে ঈদের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত সাদকাতুল ফিতর আদায় করা বেশি উত্তম ও ফজিলতপূর্ণ ।

ঈদের নামাজের পর সাদকাতুল ফিতর আদায় করা হলে ইবনে আব্বাস রা . থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ইমামগণ বলে থাকেন, তা সদকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় হবে না বরং তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে।

সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী আবদুল্লাহ বিন বাজ রহ.সহ নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে বিলম্ব করা হলেও সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব এবং তা কাজা হিসেবে গণ্য হবে এবং সুন্নত পরিপন্থী ও মাকরুহ হিসেবে গণ্য হবে।

লেখক ও গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রবন্ধ

ঈদুল ফিতর: মুমিনের শ্রেষ্ঠ উৎসব

মাও. ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী (কাশিয়ানী)

ঈদ আরবি শব্দ। ঈদ শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে, তার মধ্যে একটি অর্থ হলো ফিরে আসা। এ দিবসটি মুসলমানদের জীবনে বারবার ফিরে আসে এবং সবাই একত্র হয়ে উদ্‌যাপন করে বলেই এ দিনকে ঈদ বলা হয়। ঈদ শব্দ দ্বারা এ দিবসের নাম রাখার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ দিবসে তাঁর বান্দাদেরকে নিয়ামাত ও অনুগ্রহ দ্বারা বারবার ধন্য করেন ও তাঁর দয়ার দৃষ্টি দান করেন। ঈদের অন্য একটি অর্থ, খুশি বা আনন্দ; মুসলমানদের জন্য রয়েছে দুটি আনন্দের দিন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এ দুটি দিবসই অত্যন্ত মর্যাদাশীল, আনন্দ ও খুশির দিন। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম উম্মাহর জন্য খুশির সওগাত নিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত ঈদ। ঈদ পবিত্র, ঈদ খুশির, ঈদ আনন্দের, ঈদ ক্ষমার, সব ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে বুকে জড়ানোর দিন হলো ঈদ।

ইসলামি শরিয়তে ঈদের প্রচলন:

আল্লাহ রববুল আলামিন মুমিন মুসলমানদের প্রতি নিয়ামত হিসেবে ঈদ দান করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরিফ হিজরতের পর প্রথম হিজরিতেই শুরু হয় ঈদ। পূর্বেকার নবিদের সময় ঈদের প্রচলন ছিল না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরিফ হতে হিজরত করে যখন মদিনা শরিফ পৌঁছলেন, তখন মদিনাবাসীরা ‘নওরোজ’ ও ‘মেহেরজান’ নামে দুটি আনন্দ দিবস উদ্‌যাপন করতে দেখলেন, যে দিবসগুলোতে তারা শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তি করে। হজরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ দুদিনের কী তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসী উত্তর দিলেন: আমরা জাহেলি যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ দু'দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটি দিন দিয়েছেন। তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।’ (সুনানে আবু দাউদ: ১১৩৪)

হাদিস শরিফের আলোকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, ঈদের প্রকৃত অর্থ শুধু দামি, রঙিন জামা, হরেকরকম মুখরোচক খাবার আর নানা ধরনের খেলাধুলা এবং আনন্দ-উৎসবের নাম-ই নয়। ধনী-গরিবের এক কাতারে নামাজে দাঁড়ানো শুধু ঈদ নয় বরং তাদের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনাও ঈদের উদ্দেশ্য। ঈদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: ‘আর যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করতে পার এবং তোমাদেরকে

যে সুপথ দেখিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব-বড়ত্ব প্রকাশ কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞ হও।' (সুরা বাকারা: ১৮৫)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, ঈদের উদ্দেশ্য হলো:

১. আল্লাহর বড়ত্ব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা।

২. আল্লাহ যে নেয়ামত দান করেছেন, তার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

আমাদেরকে আল্লাহর বিধান এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুসরণে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে। ঈদুল ফিতরে নবি সা. আমাদের জন্য কী কর্মসূচি দিয়েছেন, সেটা আমাদের জানতে হবে। কারণ ঈদ আমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। এ দিনে অনেক কাজ আছে যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হতে পারি এবং ঈদ উদযাপনও একটি ইবাদাতে পরিণত হতে পারে।

ঈদের দিন করণীয়

ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তারা ইশা ও ফজর নামাজের মধ্যে কী আছে তা জানতে পারতো, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুটি নামাজের জামাতে শামিল হতো।' (সহিহ বুখারি: ৬১৫)

ঈদের নামাজ আদায় করা:

'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে বের হয়ে দু'রাকাত ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। এর পূর্বে ও পরে অন্য কোনো নামাজ আদায় করেননি।' (সহিহ বুখারি: ৯৮৯)

ঈদের দিন গোসল করা:

ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, 'তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।' (সুনানে বায়হাকি: ৫৯২০)

পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া:

হজরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'সুন্নাত হলো ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।' (সুনানে তিরমিজি: ৫৩৩)

যে পথে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসা:

'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে পথ বিপরীত করতেন।' (সহিহ বুখারি: ৯৮৬)

ঈদের দিনে খাবার গ্রহণ:

ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের নামাজ আদায়ের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা সুন্নত। বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে কোনো কিছু না খেয়ে বের হতেন না। (সুনানে তিরমিজি: ৫৪৫) অন্য হাদিসে আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন।

ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময়:

ঈদে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো একটি উত্তম কাজ। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামগণ ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অপরকে বলতেন: 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা' অর্থ–আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনার ভালো কাজগুলো কবুল করুন। 'ঈদ মুবারক' ইনশাআল্লাহ বললেও অসুবিধা নাই।

তাকবির পাঠ করা:

তাকবির পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়। তাকবির হলো: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। বাক্যটি উচ্চৈঃস্বরে পড়া। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবির পাঠ করতেন।' (মুসতাদরাক: ১১০৬)

নতুন বা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা:

ঈদে উত্তম জামা-কাপড় পরিধান করে ঈদ উদ্‌যাপন করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন।' (আলজামে: ১৮৮৭)

ইবনুল কায়্যিম আল জাওযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কিতাব যাদুল মা'দে বলেছেন: 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ঈদেই ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন।

ঈদের খুতবা শ্রবণ করা:

ঈদের খুতবা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ বিন সায়েব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদ উদ্‌যাপন করলাম। যখন তিনি ঈদের নামাজ শেষ করলেন, বললেন: আমরা এখন খুতবা দেবো। যার ভালো লাগে সে যেন বসে আর যে চলে যেতে চায়, সে যেতে পারে।' (সুনানে আবু দাউদ: ১১৫৭)

দোয়া ও ইস্তেগফার করা:

ঈদের দিনে আল্লাহ তাআলা অনেক বান্দাকে মাফ করে দেন। মুয়ারিরক আল ঈজলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ঈদের এই দিনে আল্লাহ তাআলা একদল লোককে এভাবে মাফ করে দেবেন, যেমনই তাদের মা তাদের নিষ্পাপ জন্ম দিয়েছিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তারা যেন এই দিনে মুসলিমদের জামায়াতে দোয়ায় অংশগ্রহণ করে।' (লাতাইফুল মায়ারিফ)

মুসাফাহা ও মুআনাকা করা:

মুসাফাহা ও মুআনাকা করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, 'একবার হাসান ইবনে আলি রাযি. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন, তিনি তখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মুআনাকা (কোলাকুলি) করলেন।' (শারহুস সুন্নাহ)

ফিতরা দেওয়া:

রমজান মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণার্থে অভাবগ্রস্তদের ফিতরা প্রদান করা। 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করার আদেশ দিলেন।' (সহিহ বুখারি: ১৫০৩)

এতিম অনাথ অসহায়দের খোঁজ-খবর নেওয়া:

তাদেরকে খাবার খাওয়ানো এবং সম্ভব হলে তাদের নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এটা ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, 'তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন,

এতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।' (সুরা আদদাহর: ৮)

আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া:

ঈদের সময় বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়। এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।' (সহিহ বুখারি: ৬১৩৮)

প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া :

ঈদের সময় প্রতিবেশীর হক আদায়ের সুযোগ তৈরি হয়। কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে, 'তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, এতিম, মিসকিন, প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথি, মুসাফির ও তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে, যারা দাম্ভিক, অহংকারী।' (সুরা নিসা: ৩৬)

মন-মালিন্য দূর করা:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, তার ভাইকে তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। তাদের অবস্থা এমন যে, দেখা-সাক্ষাৎ হলে একজন অন্যজনকে এড়িয়ে চলে। এ দুজনের মাঝে ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে প্রথম সালাম দেয়।' (সহিহ মুসলিম: ৬৬৯৭)

ঈদ মুসলমান জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব। মুসলমান হিসাবে আমাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি রয়েছে। সে সংস্কৃতি হতে হবে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস সমর্থিত। ঈদ পালনে ইসলাম সমর্থন করে না এমন সব বিনোদন বা সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত হওয়া খুবই গর্হিত কাজ। মুসলমান হিসাবে আমাদের এসব বর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি ঈদ উদ্‌যাপনের নামে বিজাতীয় আচরণ মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে অমুসলিমদের অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে মুসলমানদের অনেকেই। আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।' (আবু দাউদ: ৪০৩৩)

ঈদ উৎসবের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা তার ধর্মীয় জীবনের এবং সমাজ জীবনের বহিঃপ্রকাশ, সাম্য মৈত্রীর সন্ধান লাভ করে। বিশ্ব মুসলমানের জীবনে রমজান যেমন আত্মশুদ্ধি ও সাম্যের বার্তা নিয়ে হাজির হয়, ঠিক তেমনই ঈদ বয়ে আনে সাম্য-মৈত্রী-সম্প্রতির সুমহান বার্তা। ঈদ হোক আমাদের জীবনের নিত্যসাথী।

শিক্ষক ও লেখক

প্রবন্ধ

যেভাবে কাটাব ঈদের দিন

মিজান ইবনে মোবারক

আল্লাহ তাআলার বড় অনুগ্রহ যে, তিনি বরকতময় রমজান মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকার অবকাশ দিয়েছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা সহ্য করার সাহস দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা একমাত্র আল্লাহর রহমতেই সম্ভব হয়েছে। রমজানের পরে প্রাপ্ত ঈদুল ফিতর মুসলমানদের জন্য আনন্দের ও উৎসবের দিন, একটি মহান ইবাদতের দিন। এর প্রচলন শুরু হয়েছে নবিজি সা.-এর মদিনায় হিজরতের পর থেকে। (সুনানে আবু দাউদ: ১/১৬১)

সেই থেকে আজ অবধি ঈদ-উৎসব মুসলিম উম্মাহের মধ্যে অত্যন্ত গৌরবের সাথে প্রচলিত রয়েছে। ঈদ যেমন আনন্দের, তেমনই ইবাদতেরও। আনন্দ ও উল্লাস করার মাধ্যমে যে ইবাদত পালন করা যায়, ঈদ তার অন্যতম উদাহরণ। শরীয়তসম্মতভাবে আনন্দ প্রকাশ করার বিষয়ে কুরআনে এসেছে, 'বলো, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত, সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়। এটি, তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম।' (সুরা ইউনুস: ৫৮)

ঈদের এ দিনটিতে করণীয় কাজগুলো করে এবং বর্জনীয় কাজগুলো হতে বিরত থেকে কীভাবে পূর্ণ দিনটি আনন্দের সাথে ও ইবাদতের সাথে কাটাতে পারি, তা তুলে ধরা হলো।

করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা:

প্রথমেই মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা যে, তিনি রোজার মতো একটি মহান ইবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে সেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন, যাদের জন্য বিচারের দিনে জান্নাতে যাওয়ার জন্য 'বাবুর রাইয়ান' নামক একটি বিশেষ দরজা স্থাপন করা হবে। অতএব, এর জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

শুকরিয়া আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা হলো, আল্লাহর দরবারে নত হয়ে সেজদা আদায় করা। এটিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আবু বকরা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা.-এর নিকট এমন একটি সুখবর এলো যে, তিনি তাতে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। (সুনানে তিরমিজি: ১৫৭৮)

২. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা:

ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ভালোভাবে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সা. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন গোসল করতেন। (সহিহ বুখারি: ১/১৩০)

নাফে রহ. হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ঈদুল ফিতরের দিন ইদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক: ৩৮৪)

৩. উত্তম পোশাক পরিধান করা:

ঈদের দিন সাধ্যের ভেতর সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করা সুন্নত। পোশাক নতুন হওয়া জরুরি নয়, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরি। রাসুল সা. ঈদের দিন সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করতেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. প্রতি ঈদে ডোরাকাটা পোশাক পরিধান করতেন। (সুনানে বায়হাকি: ৬৩৬৩)

৪. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর বা মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য আহার করা:

মুস্তাহাব হলো, ঈদগাহে যাওয়ার আগে কয়েকটি খেজুর খেয়ে যাওয়া এবং এক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যার প্রতি লক্ষ রাখা। খেজুরের ব্যবস্থা না থাকলে অন্য কোনো মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য আহার করা।

হজরত আনাস রা. বলেন, রাসুল সা. ঈদুল ফিতরে খেজুর না খেয়ে ঘর থেকে বের হতেন না। তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন। (সহিহ বুখারি: ৯৫৩)

এ আমল হলো ঈদুল ফিতরের জন্য প্রযোজ্য। কেননা, ঈদুল আজহার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো, না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং কুরবানির গোশত দিয়ে প্রথম আহার করা।

৫. ঈদগাহে যাতায়াতের সময় তাকবির বলা:

ঈদের দিন বেশি বেশি তাকবির পাঠ করা উচিত। এতে একদিকে যেমন সওয়াব অর্জিত হয়, অন্যদিকে তেমন ইসলাম ধর্মের শাশ্বতধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ঈদগাহে যাতায়াতের সময় ঈদুল ফিতরের দিন তুলনামূলক নিম্নস্বরে তাকবির বলা আর ঈদুল আজহার দিন উচ্চৈঃস্বরে তাকবির পাঠ করা সুন্নত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।' (সুরা বাকারা: ১৮৫)

ইমাম জুহরি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, নবিজি সা. ঈদুল ফিতরের দিন তাকবির পাঠ করতে করতে ঈদগাহের দিকে গমন করতেন এবং নামাজ পড়া অবধি এ তাকবির পাঠ অব্যাহত রাখতেন। নামাজ শেষ হলে তাকবির পাঠ বন্ধ করে ফেলতেন। (সিলসিলাতুল আহাদিস আস সহিহাহ: ১৭১)

৬. রাস্তা পরিবর্তন করে ঈদগাহে যাতায়াত করা:

ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে আসা সুন্নত:

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ঈদের দিন ঈদগাহে আসা-যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করতেন। (সহিহ বুখারি: ৯৮৬)

৭. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া: হাঁটায় অসুবিধা না থাকলে পায়ে হেঁটে ইদগাহে যাওয়া সুন্নত। ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সা. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ঈদগাহ থেকে ফিরতেন। (ইবনে মাজাহ: ১২৯৫)

৮. সদকাতুল ফিতর আদায় করা:

ঈদের দিনে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য নিজের ও অধীনস্থদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। সদকাতুল ফিতর আদায়ের উত্তম সময় হলো, ঈদের নামাজে যাওয়ার পূর্বেই তা আদায় করা। দরিদ্র ও অভাবী লোকেরা এর হকদার। তাদের কাছে তাদের প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রোজাদারকে অর্থহীন ও অশ্লীল কথা-কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা হিসেবে রাসুল সা. সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। যে (ঈদের) নামাজের আগে তা আদায় করবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে নামাজের পর আদায় করবে, তা সাধারণ সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।' (সুনানে আবু দাউদ: ১৬০৯)

৯. ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করা:

ঈদের দিন সকালে পুরুষদের জন্য ঈদের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। নির্দিষ্ট নিয়মে জামাতের সাথে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা এবং তারপর ঈদের খুতবা দেওয়া ও শোনা কর্তব্য। ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করা উত্তম। কারণ, রাসুল সা. সর্বদাই খোলা মাঠে ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। বৃষ্টির কারণে একবার শুধু মসজিদে আদায় করেছেন। যা প্রমাণ করে, ঈদের জামাতের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো, মাঠে আদায় করা।

বাকি কেউ যদি মসজিদে আদায় করে, তাহলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। তবে ইচ্ছাকৃত সুন্নতকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। (ফতোয়ায়ে শামি: ৩/৪৯)

১০. মনোযোগ দিয়ে খুতবা শ্রবণ করা:

অনেকেই ঈদের নামাজ শেষ হওয়ার পর খুতবা না শুনে চলে যায়। এটা অনুচিত। বরং উচিত হলো, ঈদের নামাজ শেষে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনা।

আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সা.-এর সঙ্গে আমি ঈদগাহে উপস্থিত হলাম। এরপর তিনি আমাদের নামাজ পড়িয়েছেন। অতঃপর বললেন: 'আমরা নামাজ শেষ করেছি। যার ইচ্ছা সে খুতবা শোনার জন্যে বসবে, আর যার চলে যাওয়ার ইচ্ছা, সে চলে যাবে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১০৭৩)

১১. শুভেচ্ছা বিনিময় করা:

ঈদের অভিনন্দন জানানো সাহাবায়ে কেরামের রীতি এবং এটি চারটি মাজহাবের সর্বসম্মত ফতোয়া যে, ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে কোনো সমস্যা নেই। এর জন্য যে-কোনো ভালো শব্দ ব্যবহার করা যেতে

পারে। এর জন্য সর্বোত্তম শব্দ হলো ‘তাকব্বালাল্লাহ মিন্না ওয়া মিনকুম।’ কেননা এভাবে মোবারকবাদ জানানো সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে প্রমাণিত। তাবেয়ি জুবায়ের ইবনে নুফাইর রহ. বলেন, সাহাবিগণ ঈদের দিন পরস্পরে সাক্ষাৎকালে বলতেন, ‘তাকব্বালাল্লাহ মিন্না ওয়া মিনকুম।’ (ফাতহুল বারিঃ ২/৫১৭)

১২. ঈদগাহ থেকে ফিরে নফল নামাজ আদায় করাঃ

ঈদের নামাজের পরে ঈদগাহ থেকে বাড়ি ফিরে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা সুন্নত।

আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সা. ঈদের নামাজের আগে কোনো নামাজ পড়তেন না। তবে নামাজের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১২৯৩)

১৩. আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নেওয়াঃ

ঈদের দিন আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া ও তাদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া উচিত। বছরের অন্য দিনগুলোতে বিভিন্ন ব্যস্ততায় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরও খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই এই দিনটিতে এর সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এতে আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করা হয় এবং সম্পর্ক মজবুত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা ইবাদাত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, এতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথি, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহংকারী। (সুরা নিসাঃ ৩৬)

১৪. এতিমদের সাধ্যমতো দান করাঃ

আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে, যাদের মাথার উপর থেকে পিতৃত্বের ছায়া উঠে গেছে। বছরের অন্য দিনগুলোর তুলনায় ঈদের দিন তাদের খোঁজখবর রাখা সহজ হয়। এতিমদের সাথে ভালো আচরণ করা কর্তব্য। সাধ্যমতো তাদের কাপড়-চোপড় দেওয়া, খাবার এবং পানীয় উপহার দেওয়া উচিত। এটা ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে।’ (সুরা দাহরঃ ৮)

সাহল ইবনে সাদ রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসুল সা. বলেছেনঃ আমি ও এতিমের তত্ত্বাবধানকারী এই দুই আঙুলের অনুরূপ একসাথে জান্নাতে বসবাস করব। এই কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখান। (সুনানে তিরমিজিঃ ১৯১৮

১৫. বিধবাদের প্রয়োজন পূরণ করাঃ

যদি প্রতিবেশী কোনো মহিলা বা আত্মীয়দের মধ্যে কেউ বিধবা থাকে, তাহলে তার ঘরের অবস্থা জানা, সন্তানদের খোঁজখবর রাখা এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনে দিয়ে অভাব দূর করা হবে ঈদের দিনের অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবা ও মিসকিন-এর জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর

রাস্তায় মুজাহিদের মতো অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মতো। (সহিহ বুখারি: ৫৩৫৩)

১৬. দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করা:

সমাজে অনেক অভাবী ও দরিদ্র লোক আছে, যারা আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে ঈদের দিনেও ভালো পোশাক ও জুতা পরিধান করতে পারে না বা তাদের বাড়িতে ভালো খাবার রান্না করতে পারে না। এই ধরনের লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, তাদের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে তা পূরণ করার চেষ্টা করা উচিত। বাড়িতে রান্না করা পছন্দের কিছু খাবার এমন লোকদের বাড়িতে পাঠানো-এটা প্রকৃত ঈমানদারদের লক্ষণ।

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন: তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।' (সহিহ বুখারি: ১৩)

অসহায়দের সাহায্য করে স্বস্তি, তৃপ্তি ও শান্তি পাওয়া যায়। আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার গৌরব অর্জন করা যায়। তাই একজন গরিব ও অসহায় মানুষকে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, ততটুকু করতে হবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন: 'যে লোক কোনো ঈমানদারের দুনিয়া থেকে কোনো মুসিবত দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা বিচার দিবসে তার থেকে মুসিবত সরিয়ে দেবেন। যে লোক কোনো দুঃস্থ লোকের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুরবস্থা দূর করবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন। (সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯)

১৭. অসুস্থদের সেবা করা: ঈদের দিন অসুস্থ প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে যারা অসুস্থতার কারণে ঈদের আনন্দে অংশ নিতে পারেনি, তাদের সেবা-যত্ন নেওয়া। অসুস্থ মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করা খুবই পুণ্যের কাজ। রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকে, সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত বেহেশতের ফলমূল আহরণে রত থাকে। (সহিহ মুসলিম: ২৫৬৮)

এ দিনের বর্জনীয় কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. ঈদগাহে নফল নামাজ না পড়া:

ঈদের নামাজের আগে বা পরে ঈদগাহে নফল নামাজ পড়া নিষেধ।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. বেলাল রা.-কে সঙ্গে নিয়ে ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। তিনি এর পূর্বে ও পরে কোনো সালাত আদায় করেননি। (সহিহ বুখারি: ৯৮৯)

২. নামাজে অলসতা না করা:

রমজান মাস শেষ হওয়ার পর, যে আমলের মধ্যে সবচেয়ে অলসতা তৈরি হয়, তা হলো

নামাজ। রমজান মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে মসজিদগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ে, যদিও সাধারণ দিনেও নামাজ ফরজ। ইসলাম ধর্মে ইবাদতের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। যা রাসুল সা.-এর এই বাণী থেকে অনুমান করা যায়। নবিজি সা. বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন লোকদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সুনানে আবু দাউদ: ৮৬৪)

রমজানেও যেভাবে নামাজ ফরজ ছিল, রমজানের বাইরেও সেভাবে নামাজ ফরজ। এতে কোনোরূপ অলসতা করার সুযোগ নেই। তাই ঈদের দিনেও নামাজকে আদায় করতে হবে গুরুত্বসহকারে।

৩. ঈদের দিন রোজা না রাখা:

এক মাস রোজা রাখার পর ঈদের দিন হলো বান্দাদের জন্য আনন্দের দিন। তাই এ দিনে রোজা রাখা হারাম।

হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সা. দুদিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। তা হলো, ঈদুল ফিতরের দিন এবং কোরবানির ঈদের দিন। (সহিহ মুসলিম: ১১৩৮)

৪. বিজাতীয় রীতিনীতি অনুসরণ না করা:

ঈদকে কেন্দ্র করে বিজাতীয় অনেক রীতিনীতি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, ওঠা-বসায়, শুভেচ্ছা বিনিময়ে অমুসলিমদের অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে মুসলমানদের অনেকেই। আবদুল্লাহ বিন আমর রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সা. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।' (সুনানে আবু দাউদ: ৪০৩৩)

৫. বেপর্দায় চলাফেরা না করা:

ঈদের দিন নারীরা ব্যাপকভাবে বেপর্দায় রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করে। এ থেকে বিরত থাকতে হবে। অধীনস্থদেরও বিরত রাখতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন মুর্খতার যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' (সুরা আহযাব: ৩৩)

৬. অপচয়-অপব্যয় না করা:

ঈদের কেনাকাটা থেকে শুরু করে ঈদ উপলক্ষ্যে সবকিছুতেই প্রচুর অপচয়-অপব্যয় করা হয়। ঈদের দিনেও প্রচুর অপচয়-অপব্যয় করা হয়। যা স্পষ্ট শয়তানের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কোনোভাবেই অপব্যয় করো না, নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।' (সুরা বনি ইসরাইল: ২৬-২৭)

৭. মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন না করা:

ঈদের আনন্দে মদ খাওয়া ও বন্ধুরা মিলে একসাথে মাদক গ্রহণ করা—এ দিনের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এটা শরিয়তের পক্ষ থেকে হারাম। শুধু ঈদ নয় বরং অন্য কোনো দিনেও এসব করা যাবে নাআল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদি ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সুরা মায়িদা: ৯০)

৮. গুনাহে না জড়ানো:

ঈদের দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের গান-বাজনা, অশ্লীল নাটক ও সিনেমা দেখার প্রচলন রয়েছে মুসলিম সমাজে। যা ইসলাম অনুমোদন করে না, তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সেসব কবিরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।' (সুরা নিসাঃ ৩১)

৯. জুয়া খেলা ও আতশবাজি না ফোটানোঃ

ঈদের দিনে বন্ধুরা মিলে আতশবাজি ফোটানোসহ বিভিন্ন ধরনের জুয়ার আসর বসায়। এগুলো শরিয়ত বিরোধী কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদি ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সুরা মায়িদাঃ ৯০)

১০. অনর্থক কাজে সময় ব্যয় না করাঃ

অনেকেই ঈদের দিনে অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করে থাকে। অথচ জীবনের প্রতিটি সময় অনেক মূল্যবান। তাই বেহুদা কাজে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন মাজিদে মুমিন বান্দাদের গুণাবলি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আর যারা অনর্থক কথা-কর্ম থেকে বিমুখ থাকে।' (সুরা মুমিনুনঃ ৩)

১১. ঈদের দিনকে কবর জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট না করাঃ

কবর জিয়ারত করা সওয়াবের কাজ এবং আমাদের উপর মৃতদের পক্ষ থেকে হক। বছরের যে-কোনো দিন কবর জিয়ারত করা যায়। কিন্তু বছরের অন্য কোনো দিন জিয়ারত না করে কেবল ঈদের দিনকেই কবর জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা রাসুল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে সাব্যস্ত নয়। অতএব ঈদের দিনকেই কেবল কবর জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না। এজন্য রাসুল সা. বলেছেন, 'যে এমন ইবাদত করল, যাতে আমাদের কোনো নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য হিসাবে গণ্য হবে।' (সহিহ মুসলিমঃ ৪৫৯০)

১২. মানুষকে কষ্ট না দেওয়াঃ

ঈদের দিনে অনেকে এমন কাজ করে, যা মানুষকে কষ্ট দেয়। যেমন, উচ্চৈঃস্বরে গান-বাজনা করা, জোরপূর্বক টাকা আদায় করা ইত্যাদি। এগুলো শরিয়ত বিরোধী কাজ। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সা. বলেছেন, 'মুসলিম ওই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ।' (সহিহ বুখারিঃ ৬৪৮৪)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে কাটিয়ে ঈদের দিনটিকে উদ্‌যাপন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখকঃ তরুণ আলেম ও প্রাবন্ধিক

পবিত্র ঈদুল ফিতর

যোবায়ের মাহমুদ

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি- ধারা ঝরায়ে গো,
বরষের পরে আসিল ঈদ!
(কাজী নজরুল ইসলাম)

বন্ধুরা, ঈদ নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। নেই এ নিয়ে ভাবনারও কোনো কূলকিনারা। তাই এসো, আজকে আমরা প্রথমে জেনে নিবো ঈদ কী? আর কেমন করেই বা এলো ঈদ।

ঈদুল ফিতর শব্দটি আরবি। ঈদ যা আওদু থেকে উৎপত্তি এর শাব্দিক অর্থ বারবার ফিরে আসা। অবশ্য ঈদ শব্দটি এখন আমাদের সমাজে আনন্দ বা উৎসব অর্থে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অপর দিকে ফিতর শব্দটি ফিতরাত বা স্বাভাবিক অবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কোনো কিছু শেষ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় এই ফিতর শব্দটি। আবার কারো কারো মতে ফুতুর থেকে শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ নাস্তা। সুতরাং ঈদুল ফিতর অর্থ দাঁড়ায় রমজান মাসের সিয়াম শেষ করে সকাল বেলার নাস্তা গ্রহণ করার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার আনন্দ বা উৎসব।

ঈদের সূচনা যেভাবে: ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় মদীনাবাসী জাহেলী যুগ থেকে শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' এবং বসন্তের পূর্ণিমায় ' মেহেরজান' নামে দু'টো উৎসব পালন করতো। যা ছিল ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এ ব্যাপারে খাদিমুল রাসূল হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, " বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (৬২২ খৃষ্টাব্দে) পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন, তখন তাদেরকে (বৎসরে) দু'দিন খেলাধূলা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দু'দিন কিসের? সাহাবাগণ জবাবে বললেন, জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিবসে খেলাধূলা বা আনন্দ প্রকাশ করতাম। "অতপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ তায়ালা উপরি-উক্ত দিন দু'টির পরিবর্তে তা অপেক্ষা উত্তম দু'টি দিন তোমাদের খুশি প্রকাশ করার জন্য দান করেছেন- এর একটি হচ্ছে- 'ঈদুল আযহা' এবং অপরটি হচ্ছে- 'ঈদুল ফিতর'" (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

তখন থেকেই ইসলামী শরীয়তে দু'টি ঈদ আনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে।

মুসলিমদের ঐতিহাসিক এই ঈদের দিনের **প্রধান কাজ হচ্ছে সদকাতুল ফিতের আদায় করা:**

ঈদ্-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নব বিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
(কাজী নজরুল ইসলাম)

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব মাওলানা রাশেদুর রহমান বলেন,

ঈদুল ফিতর মুসলমানদের জীবনে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। ঈদের আগে দীর্ঘ এক মাস ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করেন এবং পরকালের জীবনকে সমৃদ্ধ করেন। পার্থিব জীবনে মুসলমানদের জন্য এটা অনেক বড় আনন্দের বিষয়। এ আনন্দেরই পূর্ণতা দান করে ঈদুল ফিতর। কারণ এই ঈদ ফিতরা দিয়ে গরিবের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। ঈদ ধনী-গরিবের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রমজান মাসের রোজার ভুলত্রুটির দূর করার জন্যে অভাবী বা দুস্থদের কাছে অর্থ প্রদান করা হয়, যেটিকে ফিতরা বলা হয়ে থাকে। এটি প্রদান করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী- 'তুহরাতুল্লিস সায়িম' অর্থাৎ একমাস সিয়াম সাধনায় মুমিনের অনাকাঙ্খিত ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা হলো সাদকায়ে ফিতর।

ঈদের নামাজের পূর্বেই ফিতরা আদায় করার বিধান রয়েছে। তবে ভুলক্রমে নামাজ আদায় হয়ে গেলেও ফিতরা আদায় করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে।

সাদকায়ে ফিতরের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-'তোমরা সাধ্য অনুপাতে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।' (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে স্বাধীন, গোলাম, নারী, পুরুষ, ছোট-বড় সকল মুসলিমের ওপর এক সা' খেজুর, বা এক সা' যব যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন (বুখারী ১৫০৩)

ইসলামী বর্ষপঞ্জী ১৪৪৫ সনের সাদাকাতুল ফিতর-এর হার জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২ হাজার ৯৭০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

সাদাকাতুল ফিতর বিষয়ক হাদীসগুলোতে পাঁচ ধরনের খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে : গম, যব, খেজুর, কিশমিশ, পনির। গম বা আটা দিয়ে ফিতরা আদায় করলে এক কেজি ৬৫০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১১৫ টাকা; যব দিলে তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা ৪০০ টাকা; খেজুর দিলে তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা দুই হাজার ৪৭৫ টাকা, কিসমিস দিলে তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা দুই হাজার ১৪৫ টাকা ও পনির দিলে তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার দুই হাজার ৯৭০ টাকা ফিতরা দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদের দিনের সকল কার্যক্রম মেনে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন ইয়া-রব।

শিক্ষার্থী, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা। ডেমরা, ঢাকা।

আনন্দমুখর হোক সবার ঈদ উদযাপন

আ. আজীজ বিন আ. মালেক

দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর আনন্দের বার্তা নিয়ে এলো ঈদুল ফিতর । মাহে রমাদানের শুরু থেকেই ঈদুল ফিতরের পবিত্র এ দিনটির জন্য বিশ্বজুড়ে অপেক্ষমান মুসলিম জাতির। আমরা যথাসাধ্য এই আনন্দমুখর দিনে, আনন্দঘন পরিবেশে ঈদ উদযাপন করে থাকি। আনন্দ,সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় রেখে ঈদের আনন্দ করা প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ বহন করে।

বিশ্বব্যাপী ঈদ আমাদের মাঝে যেমন আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে, তেমনি নিয়ে আসে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গত মান-অভিমান এবং ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাঁদে কাঁদ মিলিয়ে ঈদের উৎসব পালন করার মহাসুযোগ। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি আন্তরিকতার সাথে আমরা হৃদয়ের গহীন থেকে জানাই ঈদ মোবারক।

আমাদের জীবনে ঈদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ঈদ এলেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি মার্কেটিংয়ে। সামর্থ্যানুযায়ী চলে ক্রয়-বিক্রয় । ধনীদের অনেকেই জামা-কাপড় ক্রয়ের খুশিতে আত্মহারা। অথচ আমাদের সমাজে সুবিধাবঞ্চিত, আশ্রয়হীন ও অসহায় মানুষের সংখ্যা অগণিত। তাদের প্রতি আমাদের কোন অনুভূতি নেই। ভাবনা নেই। অথচ শরীয়ানুযায়ী তাদের প্রতি আমাদের রয়েছে সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। ঈদুল ফিতরের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতায় পরস্পরের শুভেচ্ছা, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা বিনিময়ের মাধ্যমে মানবিক ও সামাজিক সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটা হল ঈদুল ফিতরে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

তবে সমগ্র বিশ্বে প্রত্যেক মুসলমান যাতে ঈদুল ফিতরের আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন, সেজন্য কোরআন ও হাদীসে রমজান মাসে বেশি হারে দান-খয়রাত, যাকাত ও ফিতরা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এটা হলো ঈদুল ফিতরের অর্থনৈতিক তাৎপর্য। এ ছাড়া ঈদের নামাজ আদায় করতে যাওয়ার আগে একটি খেজুর কিংবা খোরমা অথবা মিষ্টান্ন কিছু খেয়ে রওয়ানা হওয়া সওয়াবের কাজ। ঈদুল ফিতরের ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে গোসল করা, মিসওয়াক করা, আতর-সুরমা লাগানো, এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে গমন এবং নামাজ শেষে ভিন্ন পথে বাড়ি প্রত্যাবর্তন। এ ছাড়া সর্বাগ্রে অজু-গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে, আছে নতুন পোশাক পরিধান করারও নির্দেশনা।

মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিতরের দিনটি অশেষ তাৎপর্য ও মহিমায় অনন্য। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার শেষে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদ। রোজাদার যে পরিচ্ছন্নতার ও পবিত্রতার সৌকর্য দ্বারা অভিষিক্ত হন, যে আত্মশুদ্ধি, সংযম, ত্যাগ-

তিতিক্ষা, উদারতা, বদান্যতা, মহানুভবতা ও মানবতার গুণাবলি দ্বারা উদ্ভাসিত হন, এর গতিধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে ঈদুল ফিতরের আগমন হয় । বছরজুড়ে নানা প্রতিকূলতা, দুঃখ-বেদনা সব ভুলে ঈদের দিন মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। ঈদগাহে কোলাকুলি, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে সবাইকে নতুন করে আবদ্ধ করে। ঈদ এমন এক নির্মল আনন্দের আয়োজন, যেখানে মানুষ আত্মশুদ্ধির আনন্দে পরস্পরের মিল-বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হন এবং আনন্দ সমভাগাভাগি করেন।

ঈদের দিন মসজিদে, ঈদগাহে ঈদের নামাজে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লির সমাগম হয়ে থাকে। সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে ঈদের নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে ধনী-নির্ধন, পরিচিত-অপরিচিত সবাই সানন্দে কোলাকুলি করেন। সব ঈদগাহে নিজেদের জন্য দুআ করা হয় এবং মহান রবের দরবারে দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও সংহতি কামনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী ও সব মানুষের জন্য কোনো না কোনোভাবে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন।

মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা হলো, জগতের সব মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। পৃথিবী সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি মুক্ত হোক! সন্ত্রাসের বিভীষিকা দূর হোক! আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন দৃঢ়তর হোক! আগামী দিনগুলো সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক! হাসি-খুশি ও ঈদের আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংযম, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক- এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক তামান্না। তাই আসুন, ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিই সবার মনেপ্রাণে। বুকে বুক মিলিয়ে আসুন সবাই সবার হয়ে যাই।

এ দিনে অনেক কাজ আছে; যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআ'লার নিকটবর্তী হতে পারি এবং ঈদ উদযাপনও একটি ইবাদতে পরিণত হতে পারে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে অপচয়ে মত্ত হয় এক স্তরের মানুষ এই ঈদকে কেন্দ্র করে। আর পাশের বাড়ির মানুষটি না খেয়ে থাকলেও খবর রাখে না কেউ। তাই কাছের অসহায়,আশ্রয়হীন মানুষটার প্রতি আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিব। এতে বিভেদ ভুলে ঈদ হবে সমতার। ঈদ হবে সম্প্রীতির ও ভ্রাতৃত্বের। ঈদ মুসলমানদের জন্য শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, সম্প্রীতি-সৌভ্রাতৃত্ব শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষও। এই উৎসবের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান একে অপরের আরো কাছাকাছি আসে। শুধু মুসলমান নয়, অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গেও আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। পবিত্র রমজান আমাদের চিত্তশুদ্ধির যে শিক্ষা দিয়েছে, ঈদুল ফিতর হচ্ছে সেই শিক্ষা কাজে লাগানোর দিন। আজ একটি দিনের জন্য হলেও ধনী-গরিব সবাই দাঁড়াবে এক কাতারে। ইসলাম যে প্রকৃত অর্থেই শান্তির ধর্ম, সেটি প্রমাণ করতে হবে। সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক ঈদের সওগাত। আলিঙ্গনের ভেতর দিয়ে সবাই ভুলে যাক হিংসা-বিদ্বেষ। আমাদের ঘরে ঘরে ফিরে আসুক শান্তি ও সমৃদ্ধি। বিস্তৃত হোক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ । সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক।

শিক্ষক, জামিয়া মিফতাহুল উলূম ক্বওমী মাদরাসা

ঈদুল ফিতর কি? কেন? ও কীভাবে আদায় করতে হবে?

মুফতি ফয়জুল্লাহ সীতাকুণ্ড

ঈদ কী?

ঈদ এমন এক খুশির নাম, যা বছর ঘুরে প্রতিটি বৎসরই আগমন করে থাকে। যে দিনটিকে মুসলমানদের আমোদ-প্রমোদের জন্য স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কারণ, সহিহ মুসলিমের হাদিসে উল্লেখ আছে, যখন রাসূলে কারীম সা. হিজরত করে মদীনায় তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন প্রত্যক্ষ করলেন, সেখানকার মুসলমানরা নির্দিষ্ট দু'টি দিনে আমোদ-প্রমোদ করে থাকে। একটি দিনের নাম " নাইরোজ " অপরটির নাম " মেহেরজান " । আল্লাহর রাসূল সা. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুই দিনে তোমাদের আমোদ-প্রমোদ করার হেতু কী?

তদুত্তরে তারা বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বর্বরতার যুগে এই দু'টি দিন আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম। মুসলমান হওয়ার পরও দিন দু'টিতে আমরা বরাবরের মতই আমোদ-প্রমোদ করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করলেন, মুসলমানরা নিজেদের আনন্দ উৎসবের দিন নিজেরাই ধার্য করবে, তা হতে পারে না। বরং তোমাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'টি দিন ধার্য করে দেয়া হয়েছে। একটি হল ঈদুল ফিতরের দিন। অপরটি হচ্ছে ঈদুল আযহার দিন। (সূত্রঃ সহিহ মুসলিম)

সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল, ঈদ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার্যকৃত এক আমোদ-প্রমোদ দিবস।

ঈদ কখন?

কোনো দেশের আকাশে চন্দ্র উদিত হলে আশপাশের যে ক'টি দেশ থেকে এক সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় উক্ত চন্দ্র দর্শন সম্ভব, সবগুলো দেশের জন্য পরের দিন ঈদ উদযাপন আবশ্যক। যেমন বাংলাদেশের আকাশে যদি চাঁদ উদিত হওয়া প্রমাণিত হয় অথবা এমন একটি দেশের আকাশে চাঁদ উদিত হওয়া প্রমাণিত হয়, যে দেশের চাঁদ স্বাভাবিক অবস্থায় বাংলাদেশ থেকেও দেখা সম্ভব, তখন পরের দিন বাংলাদেশবাসীসহ ঐ সমস্ত দেশের বাসিন্দাদের জন্য ঈদ পালন আবশ্যক হয়ে পড়বে, যাদের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় উক্ত চন্দ্র দর্শন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে নিছক কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা স্থানকে ফলো করার কিংবা কোনো জ্যোতি বিজ্ঞানীর মত গ্রহণের বৈধতা ইসলামে নেই।

ঈদ কার জন্য?

হযরত আবু বকর রাযি. কোনো এক ঈদের দিনে স্বীয়গৃহে দরজা রুদ্ধাবস্থায় স্বজোরে ক্রন্দন করছিলেন। অন্যদিকে অন্যান্য সাহাবাগণ পরস্পরে ঈদের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। কেউ কেউ তো আনন্দে বিভোর

হয়ে পরস্পরে তরমুজের ছিলকা ছোড়াছুড়ি করেছিলেন।
(সূত্রঃ আল-আদাবুল মুফরাদ লিল ইমামিল বুখারী, হাদিস নং- ২৬৬)
হঠাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন, খলীফার বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। দৌড়ে গেলেন সকলে আবু বকর রাযি. এর ঘরে। জিজ্ঞাসা করলেন কান্নার কারণ কি?
তখন সায়্যিদুনা আবু বকর রাযি. এর মুখ থেকে যে বাণী নিসৃত হয়েছিল, তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত! তিনি তখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইরশাদ করেছিলেন;
আজ পূণ্যবানদের জন্য ঈদের দিবস ও পাপাচারদের জন্য বিপদের দিবস। আর আমিতো জানি না, আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত। তাই কী করে কান্না থামাই? (সূত্রঃ খুৎবাতুল আহকাম)
হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব রাযি. এর এই উপলব্ধিমূলক বাণী অনুধাবনে বোঝা যায়, ঈদের আনন্দ সকলের জন্য নয়। ঈদের আনন্দতো শুধু ওইসব পূণ্যবানদের জন্য, যারা রমজান প্রস্থান গ্রহণের আগেই নিজেদের পাপ মোচন করিয়ে বন্দেগীর মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হতে পেরেছে।

ঈদ কীভাবে?

আমরা সকলেই ভাবি, ঈদের দিন বলতেই আনন্দের দিন। তাই যে যেভাবে পারে, আনন্দ করে। অথচ আনন্দের ক্ষেত্রে শরীয়তের বক্তব্যের দিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই বললেই চলে।
তাই অধিকাংশ সময় আমরা আনন্দের নামে মেতে উঠি শরীয়ত বিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস আর উল্লাসে।
ফলে রমজানের অর্জিত যাবতীয় আমলের পূণ্যের ভাণ্ডার হয়ে পড়ে শূন্য। অতএব এখনই জানতে হবে খুশি সংক্রান্ত শরয়ী নীতিমালা।
পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ: খুশিতে মেতে ওঠো না। কারণ আল্লাহ আনন্দকারিদের ভালোবাসেন না। (সূরা ক্বাসাস, আয়াত নংঃ ৭৬)
অন্যত্র বলা হয়েছে, অর্থাৎ: খুশিতে মেতে ওঠো। (সূরা ইউনুস, আয়াত নংঃ ৫৭)
এই দুই বিপরীতমুখী আয়াতের বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে তত্ত্ববিদ মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন, ইসলামী শরীয়ায় রয়েছে আনন্দ উদযাপনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি। সেই নীতি ভিত্তিক খুশিতে মেতে ওঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। নীতি লঙ্ঘন করে আনন্দ করতে বারণ করা হয়েছে অন্য আয়াতে। তাই এ পর্যায়ে আমাদের জরুরী ভিত্তিতে জানতে হবে আনন্দে মেতে ওঠার সুনির্দিষ্ট সেই শরয়ী নীতিমালা।
মুফাস্‌সিরীনের কেরাম তাফসীরের কিতাবে এবং ফুক্বাহায়ে কেরামগণ ফতওয়ার কিতাবে লেখেন, আনন্দ উদযাপন করতে গিয়ে যদি কোনো ফরজ ছুটে না যায় এবং কোনো হারাম কাজ সংঘটিত না হয়, সেই আনন্দই হল শরীয়তসম্মত আনন্দ। পক্ষান্তরে যদি খুশিতে মেতে ওঠতে গিয়ে কোনো ফরজ বিধান লঙ্ঘিত হয় কিংবা কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয়, এমন আনন্দ ইসলাম বিরোধী আনন্দ। বরং খুশি উদযাপনের নামে ধর্মহীনতা!! সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেল, ঈদের আনন্দে মেতে ওঠেও সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনো ফরজ সালাত ক্বাযা না হয়, বা পর্দার মত ফরজ বিধান লঙ্ঘিত না

হয় ইত্যাদি ইত্যাদি...। অন্যথায় ঈদের আনন্দ পরিণত হবে ধর্মহীনতায়। ফলে ডুবে যাবে রমজানভর সঞ্চয় করা ইবাদাত-বন্দেগীর সেই বিশাল তরী।

ঈদের স্পেশাল আমল কী?

ঈদুল ফিতরের দিনের দু'টি স্পেশাল আমল রয়েছে:

১. ঈদের নামায ২. ফিতরা আদায়।

ঈদের সালাত সংক্রান্ত জরুরী কিছু শরয়ী দিকনির্দেশনা;

১. ঈদের সালাত ঈদগাহেই আদায় করতে হবে। তবে অপারগ অবস্থায় অর্থাৎ বৃষ্টি-বাদল হলে, নিকটে কোনো ঈদগাহ না থাকলে, দূরবর্তী ঈদগাহে যাওয়া সম্ভব না হলে, শত্রুর আক্রমনের প্রবল আশঙ্কা থাকলে অথবা রোগ-ব্যাধী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলে, ঈদের জামাত মসজিদে বা বাড়ির ছাদে অথবা গাড়ির পার্কিংলটে কিংবা কোনো স্কুলের বারান্দায় আদায় করতে পারবে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে। **ক.** জামাতবদ্ধভাবে আদায় করতে হবে। একাকী নয়।

খ. ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন মুসল্লি থাকতে হবে।

গ.ইয়নে আ'ম তথা বিল্ডিংয়ের যেকোনো বাসিন্দা বা বাড়ির আশপাশের লোকজন আগমনের সুযোগ এবং অনুমোদন থাকতে হবে। (সূত্রঃ মাযমাউল আনহুর ও বাদায়িউস সানায়ি')

২. ঈদের সালাতে অতিরিক্ত (৬) ছয়টি তাকবীর দেয়া সহিহ হাদিসের আলোকে এবং রাসূল সা. ও সাহাবাগণের আমলের দ্বারা প্রমাণীত। আর চৌদ্দশত বৎসর যাবৎ মুসলিম উম্মাহের অবিচ্ছেদ্য ধারার আমল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

[সূত্রঃ (১) শরহু মাআ'নীল আছার <ত্বহাবী>, খঃ ২,
পৃঃ ৪৩৯, (২) মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক্ব, খঃ৩, পৃঃ ২৯৩,(৩) মু'জামে কাবীর তাবরানী, খঃ ৯, পৃঃ ৩০৪)]

৩. যাদের সাথে ঈদগাহে আসার পূর্বেই সাক্ষাত ও কুশল বিনিময় হয়েছিল, ঈদের সালাত শেষে তাদের সাথেই ফের সাক্ষাত করে কোলাকুলি করার কোনো প্রথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে পাওয়া যায় না বিধায় তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য।

ফিতরা সংক্রান্ত জরুরী কিছু শরয়ী নির্দেশনা:

১. গরীব-দুঃখীদের অভাব দূরীকরণের সহজলভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ খাদ্য-শষ্যের স্থলে তার মূল্য তথা অর্থ প্রদানের মাধ্যমেও ফিতরা আদায় করা যাবে। যেহেতু খোদ রাসূল সাঃ নিজে খাদ্য ভিন্ন অন্য বস্তুর ফিতরাও কালেকশন করেছিলেন বলে সহিহ বুখারী শরীফের হাদিসে বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ: হে মুসলিম নারীরা! তোমরা ফিৎরা প্রদান করো। প্রয়োজনে তোমাদের অলংকারাদি দিয়ে হলেও।

(সূত্রঃ সহিহুল বুখারী, হাদিস নং: ৯৭৭) হাদিসের পরিষ্কার নির্দেশনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, খাদ্য ভিন্ন অন্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করাও ইসলামে অনুমোদিত।

তাছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার বরাতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ: হযরত কুররাহ রহঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট ফিতরার ব্যাপারে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. এর এই নির্দেশনামূলক চিঠি পৌঁছেছে যে, প্রত্যেকে অর্ধ সা' তথা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা ততসম মূল্য (তদানিন্তন) অর্ধ রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ফিতরা আদায় করবে। (সূত্রঃ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদিস নং: ১০৩৬৯) হাদিসখানার ভাষ্য এ ব্যাপারে পরিষ্কার যে, খাদ্যের মূল্য দিয়েও ফিৎরা আদায় করা যায়। তবে রাসূল সা. এর যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মূদ্রার মূল্যমান বেশি হওয়া ও মজুদ কম হওয়ার কারণে ততকালীন লোকেরা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় করতো। অর্থাৎ বিশেষ কিছু খাদ্যকে মূদ্রার স্থলে ব্যবহার করতো। অতএব প্রমাণ হল, গম, খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদিকে মূদ্রার স্থলে রেখে তদানিন্তন সময়ে ফিৎরা প্রদান করা হত। সুতরাং খাদ্য দিয়েই কেবল রাসূল সাঃ ফিৎরা প্রদান করতেন, এমন সংকীর্ণ চিন্তা করার অবকাশ সহিহ সুন্নাহয় নেই।

২. গম দিয়ে ফিৎরা আদায় করতে চাইলে, অর্ধ সা' তথা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম দিয়েও ফিতরা প্রদান করা যাবে। পূর্ণ এক সা' গম দেয়া জরুরী নয়। উপরোক্ত হাদিস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাছাড়া স্বয়ং রাসূলে কারীম সাঃ এর পবিত্র বাণীতেও বিষয়টি ফুটে উঠেছে। যেমন,

অর্থাৎ: রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, পূর্ণ এক সা' গম দিয়ে দুইজন ব্যক্তি ফিৎরা আদায় করতে পারবে। (সূত্রঃ আবু দাঊদ, হাদিস নং: ১৬১৯)

অপর এক জায়গায় এসেছে, অর্থাৎ: আল্লাহর রাসূল সাঃ অর্ধ সা' তথা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম দিয়ে ফিৎরা প্রদান করাকে ওয়াজিব ও আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। (সূত্রঃ আবু দাঊদ, হাদিসনং: ১৬২২)

হাদিসদ্বয়ের বিবরণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, রাসূল সা. নিজেই এক সা' গম কে দুই ব্যক্তির ফিতরা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ জন প্রতি অর্ধ সা' তথা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম ফিৎরা হিসেবে রাসূল সা. কর্তৃক নির্ধারিত।

রাসূল সা. এর এই নির্ধারণই পরবর্তীতে সরকারি আইনে পরিণত হয়। যেমন আবু দাঊদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে---

হাদিস খানার মর্মার্থ হল: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযী. বলেন, হযরত উমর রাযী. এর শাসনামলে ব্যাপক ভাবে সহজেই গম সরবরাহ করা যেত বিধায় তিনি অন্যান্য খাদ্যের স্থলে অর্ধ সা' তথা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গমকে ফিতরার মানদণ্ড হিসেবে সরকারি আইনে রুপান্তরিত করেন। (সূত্রঃ আবু দাঊদ, হাদিস নং: ১৬১৪, হাদিসটির মান: সহিহ)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিষয়গুলো অনুধাবন করতঃ মেনে চলার সৌভাগ্য দান করুক। আমিন

শিক্ষক ও গবেষক

প্রবন্ধ

ঈদুল ফিতর: তাৎপর্য, শিক্ষা ও ফজিলত

মুফতি আইয়ুব নাদীম

দীর্ঘ এক মাসের ইবাদতের বসন্তকালের পর, সীমাহীন প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে দুয়ারে উপস্থিত, মুসলমানদের শীর্ষ উৎসব, ঈদুল ফিতর। ঈদ মানে আনন্দ-খুশি-উৎসব। এই খুশি-আনন্দ-উৎসব উদযাপন করা মানুষের স্বভাবজাত একটি বিষয়। ধর্ম-বর্ণ জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশা মানুষের জন্য ঈদ আছে। আছে আনন্দ-খুশি ও উৎসবের বিশেষ দিন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঈদ আছে, প্রতিটি জাতিরই খুশির দিন আছে। আর এটা আমাদের ঈদ, আমাদের খুশির দিন।'-বুখারী:৩৯৩১

যেভাবে ঈদ পেলাম:

আমাদের এই ঈদ উৎসব প্রবর্তন হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন সেখানকার অধিবাসীদের দেখলেন, বছরে দু'টি দিন বিশেষভাবে আনন্দ ও খুশির সাথে উদযাপন করে, আর সেই উৎসবে তাই হতো যা আমাদের দেশের মেলাগুলিতে হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদের কাছে এই উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে তারা বলল, আমরা জাহেলিয়াতের যুগে এই দিনে খেলাধুলা ও আনন্দফুর্তি করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাদের এই উৎসব তীব্র অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই দু'টি দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। একটি ঈদুল আযহা, আর অপরটি ঈদুল ফিতর।'-আবু দাউদ:১১৩৪

আমাদের ও অন্যান্য জাতির ঈদের পার্থক্য:

মানবজাতির সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যেই যেহেতু আল্লাহ তাআলার ইবাদত। তাই যাপিত জীবনে মুমিনের আনন্দ-উৎসব, শোক-তাপ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, এক কথায় সবকিছু আল্লাহর জন্য হবে এবং কোন কাজই ইবাদত বহির্ভূত হবে না। মুসলিম জাতির আনন্দ ও উৎসব উদযাপনের যত দিন বা সময় আছে, তার অন্যতম একটি ঈদুল ফিতর। আর আমাদের এই ঈদ উৎসবে শরীয়ত বিরোধী কোন ধরনের নাচ,গান,বাজনা, ঢোল,তবলা,আলোকসজ্জা,আতশবাজি ও পটকাবাজি ইত্যাদি কিছুই নেই। এক কথায় আমাদের আনন্দ-উৎসব শরীয়তের আদেশ- নিষেধর মধ্যে সীমিত। শরীয়ত সমর্থন করে না, এমন কোন কাজ এখানে নেই। আর অন্যান্য জাতির ঈদ উৎসবে শরীয়ত দিবর্জিত, নিষিদ্ধ এসব জিনিস আছে এবং এটাই তাদের আনন্দ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ও নিদর্শন।

ঈদের রাতের ফজিলত:

হযরত আবু দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি

সওয়াবের আশায় উভয় ঈদের রাত ইবাদত করবে, তার অন্তর সেদিন মরবে না; যেদিন সমস্ত অন্তর মারা যাবে।'-ইবনে মাজা:১২৮

আরেকটি হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত এবং অর্ধ শাবানের রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, তাহলে সেদিন তার অন্তর মারা যাবে না; যেদিন সমস্ত অন্তর মারা যাবে।'-মারেফাতুস সাহাবা:৫৩৩৩

ঈদের রাতে দোয়া কবুল হয়:

দোয়া মুমিনদের হাতিয়ার। দোয়ার মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। আর নিজের জীবনে নেমে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ধরণের বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। এমনকি দোয়ার ফলে জীবনের ভাগ্যও ঘুরে যায়। আর সে দোয়া যদি কবুলের গ্যারান্টি পাওয়া যায়, তাহলে হেলায়- খেলায় সময়-সুযোগ নষ্ট করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'পাঁচটি রাতে দোয়া বিফলে যায় না; এক. জুম্মার রাত। দুই. রজবের প্রথম রাত। তিন. সাবানের ১৫ তম রাত। চার. ঈদুল ফিতরের রাত। পাঁচ. ঈদুল আযহার রাত।'-শুআবুল ঈমান:৩৭১৩

ঈদুল ফিতরের শিক্ষা:

একজন সফল ও প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, যে কোন বস্তু থেকে কাঙ্খিত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা। সেই হিসেবে ঈদুল ফিতর থেকে শিক্ষা কি তা জানা জরুরি। ঈদুল ফিতরের অসাধারণ শিক্ষা হল, সেদিনের যাবতীয় কার্যক্রম থেকে মৃত্যুর ভাবনা পাওয়া যায়!

কিভাবে? হ্যাঁ, তাই বলছি। ঈদুল ফিতরের গোসল স্মরণ করিয়ে দেয়, শেষ বেলার গোসলের কথা। আমাদের জীবনের আয়ু যখন শেষ হয়ে, জীবনসূর্য যখন অস্তমিত হয়, তখন প্রত্যেককেই বিদায় বেলার গোসল দেওয়া হয়।

ঈদুল ফিতরের গোসল আমাদেরকে দারুণভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়, জীবনের সেই গোসলের কথা।

ঈদুল ফিতরের নতুন পোশাক পরিধান, স্মরণ করিয়ে দেয়, শেষ বেলার নতুন কাপড়, কাফনের কাপড়ের কথা।

ঈদুল ফিতরের সুগন্ধি ব্যবহার, স্মরণ করিয়ে দেয়, শেষ বেলার সুগন্ধির কথা।

ঈদুল ফিতরের নামাজ, স্মরণ করিয়ে দেয়, শেষ বেলার জানাজা নামাজের কথা।

এছাড়াও ঈদুল ফিতর থেকে সুশৃংখল জীবন যাপন ও ভ্রাতৃত্ববোধের মন মানসিকতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও উন্নত মন মানসিকতা আর অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ইত্যাদি মানবীয় ও কল্যাণকর গুণের শিক্ষা পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের, ঈদুল ফিতরের যথাযথ শিক্ষা নিয়ে, শরীয়ত নির্দেশিত সত্য, সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন ও সমাজ গঠন করার তাওফিক দান করুন।

লেখক ও মুহাদ্দিস, জামিয়া কাশেফুল উলূম (হাটখোলা মাদ্রাসা) মধুপুর, টাঙ্গাইল।

ঈদে হাসুক গরীব দুঃখীরাও

ইসমাঈল সিদ্দিকী

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর আনন্দের বার্তা নিয়ে উদিত হলো ঈদের চাঁদ। বছর শেষে প্রতিবারের ন্যায় আবারও ফিরে এল খুশির ঈদ। ঈদ আসে শত্রুতা ও বৈরিতার প্রাচীর ডিঙিয়ে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার সম্পর্ক তৈরি করতে। ঈদ আসে মহামিলনের মহোৎসবে মুমিনহৃদ মাতিয়ে তুলতে, পরিশোধিত হৃদয়ে পরিতৃপ্তির ছোঁয়া লাগাতে। ঈদের শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে, মানুষ মানুষকে বুকে টেনে নেবে। ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, ছোট-বড় ব্যবধান ভুলে একে অপরের মুখে হাসি ফোটাবে।

ঈদে গরিব-দুঃখীদের খোঁজ নিন: আসন্ন এই ঈদানন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বিত্তশালী ও সামর্থ্যবানরা এগিয়ে আসুন। ঈদের এই আনন্দোৎসবকে আরও রঙিন করতে গরিব ও অসহায়দের দিকে সাম্যের হাত বাড়িয়ে দিন। শহরের আবর্জনার সাথে বেড়ে ওঠা কিংবা রেলস্টেশনে পড়ে থাকা সুবিধাবঞ্চিত শিশু- কিশোরদের সাধ্যানুযায়ী কেনাকাটা করে দিন, তাদের সাথে ঈদানন্দ ভাগাভাগি করে নিন।

বয়স্কদের খবর নিই: আর যারা বয়স্ক, বয়সের ভারে ন্যুব্জ; তাদের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাই। এদের কারো প্রতি কোনো করুণা নয় বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এগিয়ে যাই। নিজেদের ঈদের কেনাকাটার কিছু অংশ তাদেরকেও দিই।

অসুস্থদের ভুলে না যাই: ঈদ-উৎসব পালনকালে সেসব ভাই-বোনদের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হয়ে বাড়িতে কিংবা হাসপাতালে পড়ে আছে। ব্যথা, যন্ত্রণা ও মানসিক পীড়নে ঈদের আনন্দ যাদের মাটি হয়ে গেছে। নতুন পোশাক কেনা দূরে থাক, পুরোনো কোনো ভালো পোশাকই যাদের নেই। আমরা যারা স্বচ্ছল আছি, এদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করি। সেবা শুশ্রূষা করে হোক, আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে হোক, এদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন 'নিজেদের কল্যাণের জন্য তোমরা যে উত্তম কাজ করে থাকো, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে পাবে।' (সুরা আল-বাকারাহ: ১১০)

এটিই ফিতরাত এটিই ইসলামের শিক্ষা: দুঃখী মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসা, বিপদগ্রস্ত লোকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলো ফিতরাত। এটিই মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। সে-ই প্রকৃত মানুষ, যে অন্য মানুষের দুঃখে দুঃখী হয়। বিপদগ্রস্তের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসে। মানুষকে বলা হয় ইনসান। কেউ কেউ বলেছেন, ইনসান শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে উনস, যার অর্থ ভালোবাসা, দরদ, মমতা। অর্থাৎ, ইনসানকে ইনসান বলা হয় 'উনসের' (সদয় হওয়ার) কারণে।

তাই দুঃখী-দরদী মানুষের সেবায় সহযোগিতায় এগিয়ে আসা মানুষের ফিতরাত তথা স্বভাবজাত বিষয়। ইসলাম যেহেতু 'দ্বীনে ফিতরত' তথা স্বভাবজাত ধর্ম, তাই মানবতার সর্বোচ্চ শিক্ষা রয়েছে ইসলামে। ইসলামের নবি হজরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন মানবতার মুক্তির দূত ও রহমাতুল লিল আলামিন। তিনি নিজে যেমন পরোপকারে সর্বাগ্রে থাকতেন, তেমনই মুসলমানদের জন্য রেখে গেছেন কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধকারী অনেক অমীয় বাণী।

তিনি বলেছেন, মুমিনমাত্রই একে অন্যের ভাই। এক মুমিন অপর মুমিনের মধ্যে এমন ভালোবাসা ও আন্তরিকতা থাকবে যে, পরস্পর একটি দেহের মতো মনে হবে। একজনের ক্ষতি আরেকজনকে ততটাই আহত করবে, মাথায় আঘাত পেলে যেমন সারা শরীর আহত হয়। বিপদগ্রস্ত ও অভাবের সময় একে অন্যের প্রতি আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। ইরশাদ হয়েছে, 'দয়া-মায়া ও হৃদ্যতায় মুমিনদেরকে দেখবে এক দেহের মতো। কোনো এক অঙ্গ আক্রান্ত হলে তার সারা শরীর নির্ঘুম ও জরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।' (সহিহ বুখারি: ৬০১১) নোমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'সব মুমিন এক দেহের মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার পুরো শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথাব্যথা হয়, তাতে তার পুরো শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে।' (সহিহ মুসলিম: ২৫৮৬)

সহযোগিতা যখন ধর্মীয় দায়িত্ব: সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও দুস্থদের পাশে দাঁড়ানো শুধু সামাজিক দায়িত্বই নয়, এটা একজন মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। যেমন রাসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তির অতিরিক্ত বাহনজন্তু বা বাহনের খালি জায়গা আছে, সে যেন বাহনহীন ব্যক্তিকে তা দিয়ে সাহায্য করে। কোনো ব্যক্তির যদি অতিরিক্ত পাথেয় থাকে, সে যেন পাথেয়হীন ব্যক্তিকে তা দিয়ে সাহায্য করে। বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি এভাবে আরও বহু সম্পদের কথা বলেছেন, তাতে আমাদের মনে হতে লাগল যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কোনো অধিকার নেই। (সহিহ মুসলিম: ১৭২৮)

আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাই: সারা বছর কর্মব্যস্ততার কারণে আমরা অনেক আপনজনকেই ভুলে থাকি। খোঁজখবর

নেওয়ার সময়-সুযোগ হয়ে ওঠে না। ঈদের উৎসবে অবসরযাপনের দিনগুলোতে আমরা আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নিই। তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাই। সুখ-দুঃখের কথা শুনি। কেউ আর্থিক টানাপোড়েনে থাকলে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই।

জীবন চলার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে কারও কারও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। ঈদের সময় পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করা ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উত্তম সময়। হাদিসে এসেছে, রাসুল সা. বলেছেন, 'কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। তাদের অবস্থা এমন যে, দেখা সাক্ষাৎ হলে একজন অন্যজনকে এড়িয়ে চলে। এ দুজনের মাঝে ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে প্রথম সালাম দেয়।' (সহিহ মুসলিম : ৬৬৯৭)

আগামী দিনগুলো সত্য, সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক। হাসি-খুশি ও ঈদের অনাবিল আনন্দে প্রতিটি মানুষের জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠুক। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তী লাভ করুক—এটাই হোক ঈদ-উৎসবের ঐকান্তিক কামনা। তাই আসুন, ঈদের নির্মল আনন্দ ছড়িয়ে দিই সবার মনে-প্রাণে; বুকে বুক মিলিয়ে চলুন সবাই সবার হয়ে বলে যাই, 'ঈদ মোবারক আস্-সালাম।'

সহকারী মুফতি: জামিয়া ইসলামিয়া রওজাতুল উলুম (মিরপুর ১১)

জ্ঞানে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

মারুফ হাসান

জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা, প্রতিটি পদে পদে, অলিতে-গলিতে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মুসলিমদের অবদান কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল। এই পৃথিবীতে যাকিছু আছে, সবই তো আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। তবে কেনই বা তা আলাদা করছি? কেনই বা বলছি যে, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদানের কথা? এটি বলার কারণ হলো—এই পৃথিবীতে প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১৯০ কোটি রয়েছে মুসলিম। তাহলে প্রায় ৬১০ কোটি মানুষ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতকে মেনে নেয়নি। তারা বলে এই পৃথিবীতে মুসলিদের কোনো অবদান নেই। অথচ এই আধুনিক বিজ্ঞানের যেই অবদান, তা মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনারই ফল। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিমরা সমগ্র বিশ্বে সভ্যতা সংস্কৃতিকে আলাদা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কি দেখ না? আসমান-জমিনে যাকিছু আছে, তার সবই আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতগুলো পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন'।

এখানে আল্লাহ আমাদেরকে তার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। সেই থেকে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখেছেন। যার ফলে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী এই দীর্ঘ সময়টাকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। রাসুল সা.-এর যুগ, সাহাবিদের যুগ, তাবেয়িদের যুগ ও তাবে-তাবেয়িদের যুগকে মূলত ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। আর অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলার কারণ হচ্ছে, এই সময়ে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখে।

ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, ঔষধশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যাসহ কোনটিতে মুসলিমদের অবদান নেই? বিজ্ঞানের প্রায় সবকটি শাখায় মুসলিমরা অবদান রেখেছে। চিকিৎসাশাস্ত্র তার মধ্যে অন্যতম। চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। আল-রাজি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও রয়েছেন—আল কিন্দি আব্বাস ইবনে ফিরনাস, আলী ইবনে সাহল রাব্বান, আত-তাবায়ী সাহল আল-তামিমি, ইবনে হাইসাম, আল বিরুনি, ইবনে সিনা, আল-তামিমি, ইবনে জুহর,

ইবনে রুশদ, আবুল কাসেম জাহরাবিসহ আরও অনেকে।

আব্বাসি শাসনামলে বাগদাদে বিশ্বের সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়রোতে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। সেখানে একসঙ্গে অন্তত আট হাজার রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারতো। মুসলিম স্পেনের বিশিষ্ট শল্যবিদ আবুল কাসেম জাহরাবির 'আততাসরিফ' গ্রন্থটি ১৪৯৭ সালে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই বইটি অন্তত ৫০০ বছর শল্যচিকিৎসায় পশ্চিমাদের কাছে উৎসগ্রন্থ হিসেবে সমানভাবে সমাদৃত ছিল। এই গ্রন্থের ব্যাপারে এ কথাও প্রচলিত ছিল যে, এটি ইউরোপে শল্যচিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের ভিত্তি স্থাপনে অন্যতম প্রধান সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। সে সময়কার চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের জন্য ত্রি-খণ্ডের এ বিশ্বকোষটি ছিল অক্সিজেনস্বরূপ। সার্জারি থেকে শুরু করে মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, অপথ্যালমোলজি, অর্থোপেডিক্স, প্যাথলজি, দন্তবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, শিশুচিকিৎসা সবই ছিল আত-তাসরিফের ভেতর। আলরাজি আলকেমিও অন্যান্য বিষয়ের উপর ১৮৪টিরও বেশি বই লিখেছেন। জাবির ইবনে হাইয়ান চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রায় ৫০০টি বই লিখেছেন।

ইবনুন নাফিস ছিলেন একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, শাসনালি, হৃদপিণ্ড শরীরে শিরা উপশিরায় বায়ু ও রক্তের প্রবাহ সম্পর্কে বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। এভাবেই মুসলিম বিজ্ঞানীরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। আজকের এই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অসামান্য ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের যেমন আবদান ছিল। ঠিক তেমনই ঔষধশাস্ত্রেও ছিল বিশাল ভূমিকা। বিভিন্ন রোগের সমাধান প্রসঙ্গে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা। মুসলিম বিজ্ঞানীরা শুধু চিকিৎসা ও ঔষধশাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিভিন্ন দেশে বিখ্যাত সব হাসপাতাল। তার মধ্যে রয়েছে—সিরিয়ার দামেস্ক শহরের আল-নুরি হাসপাতাল, জেরুজালেমের আল-সালহানি, বাগদাদের আল-সাইয়িদাহ, আল-মুক্তির আদুদি হাসপাতাল, কায়রোর আল-মানসুরি হাসপাতাল, আফ্রিকার মরক্কোর আল-মারওয়ান ও তিউরিসের মারাকেত হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য।

যেখানে বিজ্ঞানের ভাষাই হচ্ছে গণিত, সেখানে এই গণিতের আবিষ্কারক হচ্ছেন মুসলিমরা। ইউরোপ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে একেবারেই পিছিয়ে ছিল, তখন মুসলিমরা

ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে। সেই ইউরোপই আজ বলে যে, বিজ্ঞানে মুসলিমদের কোনো অবদান নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ এ কথা কেউ ভাবে না যে, এই জ্ঞান-সভ্যতা অন্বেষণের শুরুটা কে করেছিল? মুসলমানরা এখন পশ্চাত্যের সাফল্যে গর্ব করতেই ব্যস্ত। কিন্তু হায়! যখন ইউরোপবাসীরা দস্তখত তো দূরের কথা দুহাতের সাহায্যে টিপসইও দিতে পারতো না, তখন স্পেনে একজন অশিক্ষিত মুসলিম লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না। আজ মুসলিম-সমাজ তাদের মূল পুঁজি কুরআন-হাদিসকে অবহেলা করে বিশ্ববাসীর হাসির খোরাক ও হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। ফলে আড়ালে ঢুকে গেছে মুসলমানদের উদ্দীপ্ত ইতিহাস। কিন্তু আমরা যদি হতাশাগ্রস্ত না হয়ে এ আলোচনা থেকে আমাদের হৃদয়ে কিছুটা আশার আলো সঞ্চালন করতে পারি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রায়োগিক চর্চায় আবার মনোযোগী হতে পারি, তাহলে আমাদের সেই সোনালি অতীত আবার ফিরিয়ে আনতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষার্থী, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউপি, ইন্ডিয়া।

ঈদ: কষ্টের খামে মোড়ানো স্মৃতি

জাকারিয়া জুবায়ের

এক. আজ ২৩শে রমজান। গতরাতে মাদরাসায় ঈদের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। যদিও দেশের অধিকাংশ মাদরাসা এখন ছুটি, কিন্তু আমাদের মাদরাসা পুরো ব্যতিক্রম। সুদীর্ঘ ছুটি নাকি ছাত্রদের পড়ালেখার প্রতি নিশ্ছিদ্র অভিনিবেশ নষ্ট করে দেয়। তাই এ ব্যতিক্রম ভাবনা। আমাদের মাদরাসার আরেকটা সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, বোর্ডিং সারা বছর খোলা থাকে। অধিক পাঠাগ্রহী ছাত্ররা যাতে পড়ালেখার সুযোগ পায়।

ছুটি ২৪শে রমজান থেকে ৬ই শাওয়াল। ঈদের পরে গুনে গুনে ছয় দিন। সবার মুখে হাসি। কাশফুলের ন্যায় শুভ্রতা সবার চোখেমুখে। ব্যাগ-পত্র গোছাচ্ছে আর খোশ গল্পে মেতে আছে। মনের বাগানে যেন শুকতারার মেলা, হাসনাহেনার মাতাল করা ঘ্রাণ। যে আনন্দে সবাই মাতোয়ারা।

কিন্তু আমার মনটা ভালো নেই। শুয়ে শুয়ে আল মাহমুদের 'পানকৌড়ির রক্ত'টা পড়ার চেষ্টা করলাম। মন বসলো না। মনের রাজ্যে বিষাদের আনাগোনা। সুখপাখি তো উড়াল দিয়েছে সেই কবে। মা মারা যাওয়ার দিন। নতুন মা ঘরে আসা পর্যন্ত ভালোই ছিলাম। কিন্তু তারপর...

এই দেখো চোখ দুটো ভিজে উঠেছে। ছলছল করছে। মোটে বাঁধ মানে না। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসতে চায়। কপাল ছুঁয়ে কী যে মজা পায়, খোদা তাআলাই ভালো জানেন। আর আমার চোখের পানি ছাড়া কিইবা আছে আপন। আব্বা প্রথম প্রথম আদর করতেন। নতুন মা কী সব কানপড়া দিয়েছে, এখন তো সহ্যই করতে পারেন না।

—কিরে আহমাদ, মনমরা হয়ে শুয়ে আছিস! বাড়ি যাবি না?

—রোকনুদ্দীন এসে জিজ্ঞেস করল। আমি সেই কখন থেকে লক্ষ করছিলাম, সে ব্যাগ গোছাচ্ছিল আর আড়চোখে আমাকে দেখছিল।

—নারে বন্ধু, আমাদের কি যাওয়ার জায়গা আছে?

—কী সব আজেবাজে কথা বলছিস!

বাড়ি থাকতেও তো নেই। বাড়িতে গিয়ে সৎমায়ের অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে মাদরাসায় না খেয়ে পড়ে থাকা ঢের ভালো।

—মানে বাড়িতেই যাবি না?

—আপাতত ইচ্ছা নেই।

—আরে যা; তোর আব্বা তো আছে।

—আব্বা তো মায়ের হাতের খেলনার পুতুল। যা বলে তা-ই শোনেন।

—তোর সৎমা কি তোকে একটুও আদর করে না?

—আদর বলছিস? দুচোখে সহ্য করতে পারলেও একটা কথা ছিল।

—তুই তার চক্ষুশূল হইলি কেমনে?

—জানিস এই মহিলাটা আমার বোনের উপরও সীমাহীন অত্যাচার করে। বাড়ির সবকাজ তাকে দিয়ে করায়। আর পান থেকে চুন খসলেই গায়ে হাত তোলে। আব্বাকেও কানপড়া দিয়ে পিটনি খাওয়ায়। আমার সামনে মারলে আমি প্রতিবাদ করি। তাই দেখতে পারে না। একদিন তো হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলেছিলাম। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে শুরু করছিল। তারপর আমারে কয় কী জানিস!

'অমানুষের বাচ্চা। তোর মা তো ছিল খান… বিশ্রী একটা শব্দ। আমার পক্ষে মুখে আনা সম্ভব না। তারপর বলল, নয় তোর মতো কুলাঙ্গারের বাপ তো আছিয়ার আব্বু হতে পারে না। দাঁড়া তোর স্পর্ধা ছুটাচ্ছি। আছিয়ার আব্বু আসুক।

তারপর রাতে আব্বা আমার উপর কয়টা বেত ভেঙেছিলেন ঠিক মনে নেই। পিঠে একটা দাগ এখনো আছে। ফেটে গলগল করে রক্ত বের হয়েছিল। কিন্তু কেউ ঠেকাতে আসেনি। তাদের পাষাণ প্রস্তর মনে একটুও দয়া সঞ্চার হয়নি। পিঠে হাত বুলিয়ে একটু সান্ত্বনা দিলেও সব কষ্ট ভুলে যেতাম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমার কপালে তা জোটেনি। আমি গলা কাটা মুরগির মতো ছটফট করছিলাম। পিঠের ঘা-টা ওপরওয়ালার দয়ায় সেরেছে। এজন্য বড় একটা দাগ হয়ে আছে আজও।

এ কথা শোনামাত্রই দেখলাম রোকনের চোখের কোণে দু'ফোঁটা অশ্রু চিকচিক করছে। ঈষৎ রক্তিম হয়ে গেছে চোখের সাদা মনি। ছলছল করছে আঁখিযুগল।

—বন্ধু, কষ্টের কথা শুনে শুধু শুধু কেন নিজে কষ্ট নিচ্ছিস। বাড়িতে যাবি মনটা প্রফুল্ল না থাকলে ছুটি ভালো কাটবে না।

রোকন আমার ডান হাতটা চেপে ধরল অমনি দু'ফোঁটা অশ্রু কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমি বললাম দোস্ত কাঁদিস না। আমাদের জীবনটা এমন। সব সয়ে গেছে। এখন আর কিছুই মনে হয় না। এখন ইচ্ছে, নিজে প্রতিষ্ঠিত হবো। আর ছোট বোনটাকে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করব। এটাই আমার জীবনের স্বপ্ন-সাধনা। বোনটাকে মুক্তি না দিয়ে স্বস্তির শ্বাস নিতে পারি না রে।

—আহমাদ তোদের জীবনটা কত কষ্টের! এতকিছুর পরও বেঁচে আছিস। এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর অপার করুণা। তোর জায়গায় আমি হলে কবে উপরে চলে যেতাম। বিধাতার এ বিভাজন রহস্য আমি জানি না। তবে আশা করি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ এই কষ্টের প্রতিদান সুদে আসলে পুষিয়ে দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

আমার চোখদুটো আবার ভিজে উঠল। কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না। বললাম, ‘দোস্ত তা-ই যেন হয়।’

—আহমাদ, তুই আমাদের বাড়িতেই চল। আমার রুম আলাদা। তোর থাকতে একটুও কষ্ট হবে না। সাথে আমার ছুটিটাও ভালো কাটবে। একজন সাথি জুটে যাবে।
—নারে দোস্ত। পরে কোনোদিন যাব। ভাবতেছি আব্বায় যদি শেষমেশ ফোন দেয়, তাহলে বাড়িতে যাব। দশ মাসের বেশি হয়ে গেছে বাড়িতে যাই না। আর ঈদ আনন্দ সে তো কবেই ভুলে গেছি।
—আচ্ছা, মাসুম আর মুবাশ্বির কী করবে? ওদেরও তো কেউ নেই।
—মাদরাসায় পড়ে থাকবে। তাছাড়া আর যাবার জায়গা কই! ওদের জীবন চরম অসহায়ত্বে জর্জরিত হলেও জুলুম অত্যাচার নেই। আমার জীবনে এমনটা হলেও মনে হয় ভালো হতো।
—আরে না। ওভাবে বলতে নেই। তোর আব্বু তো আছে। কদিন পর দেখবি ঠিকই বুঝবে। তখন প্রায়শ্চিত্ত করবে।
—জানি না দোস্ত। তবে আশাও করি না।
—আচ্ছা শোন, তোর আব্বু ফোন না দিলে আমাকে জানাবি। আমাদের বাড়িতে চলে আসবি কিন্তু।
—কথা দিতে পারছি না।
—ওকে জানাইস। তারপর দেখা যাবে।

দুই. চারিদিক সুনসান নীরব। পিনপতন নীরবতায় ছেয়ে আছে গোটা মাদরাসা। মোটমাট ৮-১০ জন মাদরাসায় আছি। আমাদের ক্লাসে আমরা তিনজন। নওমুসলিম মোবাশ্বির। তার তো যাওয়ার জায়গা থাকতেও নেই। ছেলেটা অসম্ভব ভালো। অনুপম আখলাকের অধিকারী। পুণ্যবান অকৃত্রিম সাধু পুরুষ। কথা-কাজে সাক্ষাৎ ফেরেশতার মতো। আর মাসুম! সে তো টিটিকেএম। যার মিনিং দাঁড়ায়—টো টো কোম্পানির ম্যানেজার। সারাদিন চর্কির মতো ঘুরবে পুরো শহর। তবুও তার শরীরে ক্লান্তির লেশ মাত্র নেই।

মাদরাসায় আমাদের সারাদিনের কাজ বলতে খাওয়া আর ঘুমানো। আর মনচাহি পড়ালেখা। আজ সাতাশের রাত পার হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আব্বা ফোন দেবেন। এবং যেতে বলবেন। কিন্তু নিরাশা আমার সঙ্গী। আশার মুখে ধুলো দিয়ে বহাল তবিয়াতে চলছে সব।

আচ্ছা, আমার সৎমা সেও তো দুই সন্তানের জননী। মাতৃত্বের বোধাবোধ আপন সন্তানের সাথে আছে নিখাদ। কিন্তু আমাদের বেলায় এসে কেন বিভাজন! পেটে ধরেনি বলে! তাই বলে কি আমরা সন্তান না? মাহাদীরও তো সৎমা। কিন্তু কত

ভালো। মাহাদী তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বর্তমানে সৎমা শব্দটার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে গেছে। শব্দটা শুনলেই শরীর রিরি করে ওঠে। আমার বোনটা কী অবস্থায় আছে আল্লাহই জানেন। বেঁচে আছে কি-না সেটা নিয়েও সন্দিহান। আল্লাহ মাফ করুন। আর ভাবতে পারছি না। গায়ের লোম কাটা দিয়েছে। বুকটা ধুকপুক ধুকপুক করছে।

কদিন আগে জাবের বলছিল, তার মা নাকি এমন দস্যি সৎমায়ের কবলে পড়েছিল। কিন্তু ওর নানা ছিল সাক্ষাৎ ফেরেশতা। বুক উজাড় করে ভালোবাসতো সব সন্তানদের। সৎমায়ের দুরভিসন্ধি তক্কেতক্কে টের পেত। একটু চোখকান খোলা রাখলেই সব পাই পাই করে ধরে ফেলত। কিন্তু সৎমা টেরই পেত না। যাকে বলে সাপ মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। আমার আব্বাও যদি এমন বিচক্ষণ হতেন।

রোকন বলেছিল জানাতে। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না। অযথা আরেকজনের উটকো ঝামেলা হয়ে কী লাভ! তার চেয়ে বরং মাদরাসাতেই থাকি। দিন তো কেটেই যাচ্ছে। যেভাবেই কাটুক না কেন।

ইশার পর পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রোকনের ফোনে ঘুম ভাঙল।

—কিরে কিছুই তো জানালি না। কোথায় আছিস?

—মাদরাসায়।

—আব্বা ফোন দিয়েছিল?

—নারে।

—আহ, কোনো সমস্যা নাই। তুই দোকানে গিয়ে একটা 'নগদ' নম্বর দে। আমি পথভাড়া পাঠিয়ে দিচ্ছি। সোজা সাতক্ষীরায় চলে আয়।

—আরে থাক দোস্ত। ভালোই আছি, অযথা তোর বোঝা হতে চাচ্ছি না। তুই বলেছিস এতেই আমি অপ্লুত। জাযাকাল্লাহু খায়রান।

—দেখ যা বলছি তা-ই শোন। বেশি কথা বলবি না।

—প্লিজ দোস্ত। হঠাৎ ওপাশ থেকে একটা নারীকণ্ঠ গর্জে উঠল—'এই আমার কাছে দে। দেখছি কেমনে আসে না। তখন কণ্ঠটা সুস্পষ্টভাবে আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হলো।

—আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছ বাবা!

-ওয়ালাইকুমুস সালাম। আন্টি আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো আছি।

—এটাকে কি ভালো থাকা বলে বাবা!

—না আন্টি। আমি সত্যিই ভালো আছি।

—হয়েছে। আমি রোকনের থেকে সব শুনেছি। তুমি আজই আমাদের এখানে চলে আসবে। তোমার একটুও অযত্ন হবে না।

—আন্টি না হলে...

—কোন না নয়। তুমি আসবে এটাই ফাইনাল। একজন মা হিসেবে অনুরোধ করছি। না আসলে কিন্তু অনেক কষ্ট পাবো।

'মা' কথাটা শুনতেই শরীরে মৃদু কম্পন খেলে গেল। মায়ের অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। পরের দিন রওনা হলাম সাতক্ষীরার পথে। খুলনা থেকে সাতক্ষীরা। দুই ঘণ্টার পথ।
এখানে এসে আমি আমার মাকে খুঁজে পেলাম যেন। দশ বছর পর মায়ের আদর কাছ থেকে অনুভব করার সুযোগ হলো। যা থেকে প্রকৃতি আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।
সন্ধ্যায় রোকন বলল ওর মা কাল সকালে জরুরি বিষয়ে আলাপ করবেন আমার সাথে। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছি না। শুনতেই মনটা ধুকপুক ধুকপুক করতে শুরু করেছে। কী অপরাধ করলাম আল্লাহই জানেন। আবার না চলে...
নাহ, আর ভাবতে পারছি না। বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটা শুরু হয়েছে। দুনিয়াতে পিতা মাতার ছায়ার মূল্য সে-ই বোঝে, যার পিতামাতা গত হয়ে গেছেন।
বোনটার সাথে কথা বলতে মন আঁকুপাঁকু করছে। দুমাস হয়ে গেল কথা হয়না। তার ওই দিনের কথাটা আজও মুহুর্মুহু কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। 'ভাইয়া আমারে তোর কাছে নিয়ে যা। আমি আর পারছি না। পরে আমার মরামুখও তোর দেখার সুযোগ হবে না কয়ে দিলাম।'
আহ দুর্বিষহ যাতনামায় জীবন। এক টুকরো সুখের আশার পথ চেয়ে আছি। বেলা ফুরাতে চলল। কিন্তু আজও দেখা পেলাম না। আর কত দেরি পাঞ্জেরি!

তিন. ফজরের নামাজ পড়ে হাঁটতে বের হলাম। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। বিস্তীর্ণ ফসলের খেত। প্রভাতের মৃদু সমীরণ ফিনফিন করে গায়ে এসে লাগছে। উদোম হাওয়ায় বুকের ভেতরটা কাঁচা সবজির মতো তরতাজা হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ হাঁটলাম। বিলম্বিত ধানখেতের কোল ঘেঁষে। প্রভাব রবির দিকে মুখ চেয়ে। বসন্তরাণী কচি কোকিলের শিরিন সুর ভেসে আসছে। তার চিত্তহরি কলরবে দেহমনে খেলছে অদ্ভুত প্রেম। কুহুকুহু কলতানে মনের সাগরে ভাবের জোয়ার বইছে। আমি প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে বিচিত্র পাখির কুৎসিত কিচিরমিচির আমার ভাব সাগরে ঘোল ঢেলে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা মোরগ চিৎকার দিয়ে উঠল। আমার নিশ্চিদ্র তন্ময় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একরাশ বিরক্তি এসে দাঁড়ালো মনের চিলেকোঠায়। রোকন আমার বিরক্তির পাতাটা পড়ে ফেলল। বলল আহমাদ, চল তোকে এই সাধারণ প্রকৃতির সামান্য প্রেম ছেড়ে অসাধারণ প্রকৃতির অসামান্য মায়ায় জড়িয়ে আনি। আমি তার নিটোল জলরাশির মতো সরল বাক্যে বিমোহিত হলাম। এবং বিস্ময়ের ঘোরে আটকা

পড়লাম। তার বাম হাতের আঙুলি দেশে আমার ডান হাত রেখে বললাম, চল তাহলে। আমি দেখতে উদগ্রীব।

—এতই বুঝি প্রকৃতি প্রেম!

—সে তো অমর। চির পবিত্র। নিষ্কলুষ। স্বর্ণধৌত।

সামনে দৃষ্টিসীমা যতদূর যায় শুধু থইথই জলরাশি। বহুদূরে বৃক্ষরাজি ঝাপসা দৃষ্টিতে আসছে। তার পাড় দিয়ে দিনমণি ঠেলে উঠছে যেন আকাশের চাঁদোয়ায়। এই জলরাশির মাঝেই লুকিয়ে আছে যেন তার উদয়াচল। কোমল হলদে কিরণ ছড়িয়ে আছে জলরাশি জুড়ে। অনুপম এক রূপ দৃশ্যমান। অনেকক্ষণ কিরণ বিলাস করলাম। দেহ মনে স্নিগ্ধতার ছড়াছড়ি।

পরিশেষ বাড়ির পথ ধরলাম। প্রকৃতি শান্ত, নীরব। মাঝে মাঝে দু-একটা ইঞ্জিনগাড়ি ভটভট শব্দের ঢেউ তুলে আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তার শব্দগুলো প্রকৃতির সাথে মিশে যাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষ এখন ঘুমে বিভোর। রোকনের বাড়িতেও সবাই ঘুমুচ্ছে। আমরাও বিছানায় পিঠ লাগালাম।

দশটা বাজে রোকনের আম্মু লম্বা করে এক ঘোমটা টেনে আমার সামনে বসে আছেন। মনটা দুরুদুরু করছে। অজানা আশঙ্কায় মনটা আনচান করছে। চিন্তাজগৎ উত্তাল হয়ে উঠছে।

—বাবা, কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না না আন্টি, কী যে বলেন না! আমি তো আপনার মাঝে দশ বছর আগে হারিয়ে ফেলা মায়ের স্মৃতি খুঁজে পেয়েছি। আবার সেই মমতার চাদরে আবৃত মায়ের আদর অনুভব করছি। বিস্তৃত স্মৃতি মন্থনের এ মহেন্দ্রক্ষণে কীভাবে খারাপ থাকা যায়?

—তুমি আমাকে মা বলেই ডাকবে কেমন?

—অবশ্যই আন্টি। —আচ্ছা শোনো, কাল ঈদ। আমি একটা বিস্ময়কর ডিসিশন নিয়েছি। সেজন্য তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।

—জি নিঃসন্দেহে, নিঃসংকোচে বলেন।

—আসলে তোমার ব্যাপারে সব শুনেছি রোকনের থেকে। তোমার একটা অসহায় আপন বোন আছে। আমি চাচ্ছি আজই তোমাদের বাড়িতে যাব।

রোকনের বড় ভাইয়ের জন্য মেয়ে খুঁজছিলাম। যদি তোমার বোনকে পছন্দ হয়, তাহলে আজই বিয়ে পড়িয়ে উঠিয়ে নিয়ে আসবো। ঈদের পর অনুষ্ঠান করব, ইনশাআল্লাহ। এখন তোমার কী মত?

আমার কণ্ঠ ধরে এলো। চোখটাও যেন ঝাপসা হয়ে আসতে শুরু করল। মনের ভেতর অপার্থিব শান্তি অনুভূত হতে থাকল। এতদিনের পুঞ্জিভূত সব কষ্ট যেন একবাক্যে ধুয়ে মুছে ছাফ হয়ে গেল। আমি কিছুই মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম আন্টির দিকে। আর চোখ দিয়ে ঝরতে থাকল আনন্দাশ্রু।

কলামিস্ট ও কথাসাহিত্যিক
শিক্ষার্থী, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা।

জামা

জিশান মাহমুদ

সন্ধ্যা থেকে ফয়সাল তার বাবার জন্য অপেক্ষা করছে। ফয়সালের জন্য তার বাবা আজ ঈদের জামা-কাপড় নিয়ে আসবেন। কাল ঈদ। ইফতারের পর পশ্চিম আকাশে যখন কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ উঠতে দেখল, তখন থেকেই ফয়সালের ঈদ-আনন্দ শুরু হয়েছে। টেলিভিশনে গান বাজছে, ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

—মা, বাবা আজ এত দেরি করছেন কেন?

—ঈদের বাজারে আজ হয়তো খুব বেশি ভিড়, ফয়সালের মা জবাব দিলো।

ফয়সাল অপেক্ষা করতে করতে আরও রাত হয়ে গেল। রাতের খাবার শেষ করে ফয়সাল টেলিভিশন দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেল তার বিছানার পাশে দুটো জামা ও একটি প্যান্ট। খুশিতে আত্মহারা হয়ে তাড়াতাড়ি প্যাকেট খুলে জামা-প্যান্ট বের করল। একটা লাল শার্ট ও একটা নীল শার্ট। প্যান্টটাও অনেক সুন্দর। বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে বাবার বিছানায় গেল। দেখল বাবা ঘুমিয়ে আছেন। আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বাবার কপালে একটা চুমু খেল।

—আমি কিন্তু জেগে আছি, চোখ মেলে বাবা বললেন।

—ফয়সাল একটু লজ্জা পেল। ফয়সালের বাবা বুঝতে পেরে ফয়সালের হাত ধরে টেনে বুকে টেনে নিলেন। এরপর ফয়সালের কপালে একটা চুমু দিয়ে বললেন,

—জামা-প্যান্ট পছন্দ হয়েছে?

—অনেক পছন্দ হয়েছে বাবা।

—তাহলে যাও, গোসল করে নাস্তা খেয়ে নাও। তারপর নতুন জামা পরে বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াও।
—আচ্ছা, বাবা।
ফয়সাল তাড়াতাড়ি ঘোসল করে নাস্তা খেল। এরপর লাল জামা আর প্যান্ট পরে তার প্রিয় বন্ধু রোকনের বাড়ি গেল।
রোকনের বাড়ি গিয়ে দেখল রোকন মন খারাপ করে বসে আছে।
—কিরে রোকন, এভাবে মন খারাপ করে বসে আছিস কেন? গোসল করে নতুন জামা-কাপড় পরবি না?
—না, এবার ঈদে আমার নতুন জামা কেনা হয়নি।
ফয়সাল-রোকনের কথাবার্তা শুনে রোকনের মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল,
—দেখো বাবা ফয়সাল, কখন থেকে বলছি আমার কথা শুনছে না। রোকনের বাবা মাস তিনেক আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে পঙ্গু হয়ে বসে আছে। তার চিকিৎসা করতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। অনেক টাকা ধারদেনা হয়ে গেছে। এবারের ঈদটা এভাবেই কাটিয়ে দে। তোর বাবা ভালো হয়ে গেলে তোকে অনেক অনেক জামা কিনে দেবে; কিছুতেই মানছে না।
রোকনের মলিন মুখ দেখে ফয়সালের খুব খারাপ লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল,
—চল আমার সাথে।
এই বলে রোকনের হাত ধরে টেনে নিজের বাড়ি নিয়ে এলো। মাকে সবকিছু খুলে বলে নিজের জন্য কেনা দুটো জামা থেকে নীল জামাটা রোকনকে দিয়ে দিলো।
নতুন জামা পেয়ে রোকনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।
ফয়সালের এমন সহানুভূতি দেখে তার মা-বাবা দুজেনই খুব খুশি হলেন। এরপর ফয়সাল ও রোকন দুজনেই নতুন জামা পরে আনন্দে ঈদ কাটালো।

শ্রীবরদী, শেরপুর

নতুন ভোরের প্রত্যাশা

★ মুহাম্মাদ সাজিদ হাসান

সারাদিনের উত্তপ্ত সূর্যটা এখন প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। কাজকর্ম শেষে সবাই ঘরে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাজানো হয়েছে ইফতারির দোকান। ইফতারের আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে সবদিকে। সায়মা আছর নামাজ পড়ে বেলকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ অনেকদিন পর বেলকনিতে আসা। বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধিমত্তা আর চতুরতায় বয়োজ্যেষ্ঠদের ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই; উচ্ছ্বাস ও উচ্ছলতায় ভরা। কিন্তু এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে জগতের সব থেকে দুঃখী মানুষ সে-ই। আশা-নিরাশার দোলাচলে এক দোদুল্যমান জীবন তার।

সায়মা আনমনে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। একঝাঁক বক দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে খুব তাড়া তাদের। সায়মা ভাবে—পাখিরা কত স্বাধীন! যখনই ইচ্ছে তখনই উড়তে পারে। যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যেতে পারে। মনে পড়ে যায় রবিন্দ্রনাথের কবিতা—*আমি ভাবি, ঘোড়া হয়ে মাঠ হবো পার। কভু ভাবি, মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার। কভু ভাবি, পাখি হয়ে উড়িব গগনে। কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে?*

সায়মা গুনগুন করে লাইন দুটো গাচ্ছিল, এরই মধ্যে পিছনে কারও উপস্থিতি টের পায়। বুঝতে পারে মা এসেছেন। পিছন ঘুরে সায়মা মাকে জিজ্ঞেস করে,

মা, পাখিদের কি রোজা রাখতে হয় না?

মা আমেনা বেগম কিছু বলেন না। চুপচাপ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। সায়মা আবার বলে, আচ্ছা মা, ওদের বাবাকেও কি পুলিশ ধরে নিয়ে যায়? একটা বদ্ধঘরে বন্দি করে রাখে? শুকনো শুকনো রুটি খেতে দেয়?

আমেনা বেগম কিছু বলেন না। সায়মা বলতে থাকে—

আচ্ছা আম্মা, ওরা আব্বুকে কেন ধরে নিয়ে গেল? আব্বুর কী দোষ ছিল? ওরা আব্বুর সাথে আমাকে নিয়ে গেল না কেন?

সায়মার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বেদনার লোনাজল। আমেনা বেগম মেয়ের এসব প্রশ্ন শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। নিজেও তো কত কেঁদেছেন স্বামীর জন্য। কিন্তু উপরওয়ালার ফায়সালা ছাড়া তো আর কিছু হয় না।

আমেনা বেগমের মনে পড়ে যায় তিন বছর আগের কথা। তখন মেয়েটার বয়স সবেমাত্র দুই বছর। হালকা-পাতলা কথা বলতে পারে। কতই না আনন্দ ছিল তখন। সেবার রোজায় সাহরিতে সবার সাথে উঠত মেয়েটা। বাবার সাথে খেতে বসতো। তাকে ভিন্ন প্লেটে খাবার দেওয়া হলেও বাবার প্লেট থেকেই খাবার খেত সে। বাবা মেয়ের খুনশুটি দেখে নয়ন জুড়িয়ে যেত আমেনা বেগমের। তারপর সারাদিন

মেয়েটার অপেক্ষা কখন বাবা আসবে। বাবার সাথে ইফতার করবে। সেই রমজানেই আমিনুল ইসলামকে ধরে নিয়ে যায় সরকারি লোকেরা। তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন জানি হয়ে গেছে। কমে গেছে উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতা। ধীর হয়ে এসেছে দুরন্তপনা-চঞ্চলতা।

এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনকাল। দুটি রমজান শেষ হয়ে এবার তৃতীয় রমজান। তবু ছাড়া পেল না লোকটা। বাবা ছাড়া মেয়েটার আজকে তৃতীয় বৎসরের প্রথম রোজা। কিন্তু তেমন কোনো আমেজ নেই কোনোকিছুতেই। ইফতারিতে এক গ্লাস শরবত আর খেজুর ছাড়া কোনো আয়োজন নেই। ইফতারের সময় প্রায় হয়ে এসেছে। একটু পরেই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়বে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি।

হঠাৎ সায়মা বলে, মা, বাবা একদিন বলেছিল ইফতারের আগে দোয়া কবুল হয়। মা আমি ইফতারি সামনে রেখে দোয়া করলাম, যারা বাবাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, কাল কেয়ামতে তাদেরকে যেন খোদার জিঞ্জিরে বন্দি করে রাখা হয়। তাদের প্রতিটি কর্মের হিসাব যেন কঠোরভাবে নেওয়া হয়।

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে সবাই ইফতার করে; আর সায়মারা বাবার পথ পানে তাকিয়ে থাকে।

শিক্ষার্থী, জামিয়া রাহমানিয়া আজিজিয়া

ফরিদ মিয়ার ঈদ

মো. ছিদ্দিকুর রহমান

ফরিদ মিয়া ছোট-খাটো চাকুরিজীবী। গত মাসে বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে, এতে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ। ১০ রোজায় জামাই বাড়িতে ইফতার পাঠিয়েছে ১৬,০০০ টাকা খরচ করে। একটু আগে মেয়ের ফোন।

—বাবা, কেমন আছো?

— হ্যাঁ মা, ভালো। তুই ভালো আছিস তো? ইফতারি পেয়ে তোর শ্বশুরবাড়ির সবাই খুশি?

— জানি না! তবে ওরা বলেছে ইফতারি একটু কম হয়েছে।

— আচ্ছা মা, বলিস, পরেরবার এর থেকে আরও বাড়িয়ে দেবো।

— বাবা শোনো, তুমি আমাদের বাড়িতে ঈদের কাপড় পাঠাবে না? তোমার দেওয়া কাপড় ওদের পছন্দ হবে না। ওরা বলেছে, কাপড় না দিয়ে টাকা দিয়ে দিতে। ত্রিশ হাজার টাকা দিলে সবার না-কি হয়ে যাবে।

—আচ্ছা মা, তুই চিন্তা করিস না।

কিছু সময় পর ছোট ছেলে তারাবি নামাজ থেকে এসে,

— বাবা, তুমি আছ?

— হ্যাঁ, আছি। কিছু বলবি?

—বাবা, ঈদের পর ফাইনাল সেমিস্টার। বেতন, ফর্ম ফিলাপ ও অন্যান্য খরচসহ ২৫ হাজার টাকা লাগবে।

—আচ্ছা, দেখি।

—না বাবা, লেট হলে এক্সাম দিতে পারব না।

ফরিদ মিয়া বালিশে মাথা রেখে চিন্তা করতে থাকে, নতুন জামাই বাড়িতে মৌসুমী ফলমূল দিতে হবে। তাতে ১০-১৫ হাজার টাকা দরকার। ঈদের পরে আবার কোরবানি, মেয়ের বাড়িতে গরু দিতে হবে। গরুর যে দাম, কমপক্ষে ৮০,০০০ টাকা তো লাগবেই। এখানে শেষ নয়, আরও রয়েছে মেয়ের বাড়িতে দেওয়ার বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন আয়োজন।

এসব চিন্তা করতে করতে ফরিদ মিয়ার মাথা আর কাজ করে না। এভাবে রাত ১২টা। হঠাৎ করে বুকের ব্যথাটা বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে যায়। ফরিদ মিয়ার স্ত্রী ডাকছেড় ওগো তোমার কী হলো?

কোনো সাড়াশব্দ নাই। স্ত্রী সালমা বেগম চিৎকার করে ওঠে। ছেলে মেয়েরা দৌড়ে আসে। কান্নার রোল পড়ে যায়। ছোট মেয়েটা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে। প্রতিবেশীরা ছুটে আসে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টা চলে। সবাই বুঝতে পারে, ফরিদ মিয়া আর নেই!

দশানী, বাগেরহাট

পথ শিশুর আর্তনাদ

✷ মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন

ইট-পাথরের শহর। যেমন শহর তেমন তার অধিবাসী। তাদের মন পাথরের মতো। মায়া-মমতা বলতে কিছুই নেই। সবাই নিজের স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত। নিজ পরিবার কেন্দ্রিক সব আয়োজন। স্বার্থসন্ধানী মহল সর্বদা স্বার্থ অর্জনে অভ্যস্ত। কখনো ভেবে দেখেনা সমাজের অবস্থা। সব দেখেও না দেখার ভান করে তারা।

রাস্তায় পড়ে থাকা একটা শিশু। নাম নাহিদ হাসান। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাসা কোথায়? ছেলেটি মুসকি হেসে বলল, আমার কোনো বাসা নেই। যেখানে রাত হয়, সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। বললাম, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সে বলল, শুনেছি কালকে ঈদ উপলক্ষ্যে এখানে গরিবদের জামা-কাপড় দেবে, তাই দাঁড়িয়ে আছি। জানতে চাইলাম তার কর্ম সম্পর্কে। উত্তরে বলল, আমি একটি গ্যারেজে কাজ করি, ওরা দুবেলা খেতে দেয়। বললাম, তাহলে ওরা তোমায় ঈদের নতুন জামাকাপড় দেবে না? বলল, শুনেছি ওরা গতকাল শপিং করেছে। যদি আমার জন্য নতুন জামাকাপড় নিয়ে আসতো, তাহলে তো আমাকে দিতো। কিন্তু এখনো দেয়নি। আর হয়তো দেবেও না।

বললাম, তোমার কি মন চায় না, অন্যদের মতো লেখাপড়া শিখে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে? তখন অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চোখের দু'ফোঁটা পানি ফেলে বলল, মন তো চায়, কিন্তু কপালে নাই। জানেন, রাতে শুয়ে ভাবি, আল্লাহ যদি আমাকে একটি পরিবার দিতো! যেখানে বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই থাকবে। বাবার আদর আর মায়ের স্নেহে গড়ে উঠবে আমার জীবন। যেখানে আমার উপর কষ্টের কোনো বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে না এবং মানুষ হিসাবে আমি পাবো সম্মান।

কেননা, এই সামাজে যার বাবা নেই, মা নেই এবং ধন-সম্পদ নেই, তার কোনো অধিকার বা সম্মান কিছুই নেই। তাকে বেঁচে থাকতে হয় জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে। কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়ে কাটে তার প্রতিটি মুহূর্ত। আজ সত্যিই এই সমাজে আমরা অবহেলিত।

নাহিদের মতো এমন হাজারো পথশিশু প্রতিদিন আকাশ পানে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলে নিঃশব্দে প্রকাশ করছে তাদের আর্তনাদ।

আমরা কি পারি না সব অহমিকা আর অহংকারকে মাটি চাপা দিয়ে এসব পথশিশুকে নিজের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনের মর্যাদা দিতে? বৃদ্ধকালে আপনার আপন ছেলের বাসায় আশ্রয় নাও মিলতে পারে। হতে পারে তখন ওই পথশিশুই আপনার বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পরোপকারে এগিয়ে আসার তাওফিক দান করুন। আমিন।

জামিয়া হোসাইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদ মাদ্রাসা। দারুস-সালাম, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

◆ ইয়াসিন আরাফাত

মফস্‌সলের জীর্ণ-শীর্ণ এক কুটিরে চিন্তিত মনে শুয়ে আছেন মনসুর আলী। সংসারের হাজারো চিন্তা তার মাথায়। আল্লাহ তাআলা তাকে যৎসামান্য যা দিয়েছেন, তাতেই তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দিনে যা আয় হয়, তা রাতের বাজারে ব্যয় করে ফেলেন। সঞ্চয়ের চিন্তা করেন না। যখন কোনো বিশেষ উপলক্ষ্য সামনে আসে, তখন খুব কষ্ট হয়।

ঈদের আর মাত্র তিনদিন বাকি। ছোট ছোট দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নতুন কাপড় দিতে হবে। এ নিয়ে তার চিন্তার কোনো অন্ত নেই। ভাবনার দুর্বিপাকে তার মন দোলায়িত হলো। চিন্তার তরঙ্গসংকুল সাগরে ভাসতে ভাসতে হারিয়ে গেলেন ঘুমের রাজ্যে।

ফজরের সুমধুর আজান কানে আসতেই ঘুম ভেঙে গেল। প্রয়োজন পূর্ণ করে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করতে জামে মসজিদে গমন করলেন। নামাজের পরে ইমাম সাহেব তালিমে বললেন, মনের বাসনা পূরণ করা ও দুঃখ দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। কোনো বস্তু, টাকা-পয়সা এগুলো সমাধা করতে পারে না।

মনসুর আলী এই বয়ান শুনে খুব আপ্লুত হলেন। মাথা থেকে চিন্তা বেশখানিকটা লাঘব হয়ে গেল। কিছু জিকির-আজকার করে ইশরাক নামাজ পড়ে কাকুতিমিনতি করে খুব দোয়া করলেন। এক এক করে সব বুঝে গেলেন যে, সন্তানের মুখে হাসি একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ফোটাতে পারেন। আমার চেষ্টা-পরিশ্রম অসিলামাত্র।

হালকা নাস্তা সেরে প্রতিদিনের ন্যায় রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রখর

রোদে রিকশা চালানো খুব কষ্টকর। তারপর মটরও নেই। সিটি কর্পোরেশনের নির্দেশ। তারা কি আর রিকশা হাঁকানোর কষ্ট বুঝবেন? তারা তো নামিদামি গাড়িতে চড়েন।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হলো, পেটের টানে খাবার খেতে বাড়িতে এলেন। ছোট মেয়ে নুসরাত কোমলকণ্ঠে আবদার জানালো—পাড়ার বান্ধবীরা নতুন কাপড় কিনেছে। আমাকেও একটি কিনে দেবে! এই আবদার কি আর ফেলানো যায়? সবসময় তো আবদার করে না। মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে বললেন—হ্যাঁ, মা কিনে দেবো। কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিলো। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যা আয় হয়, তা অতি সামান্য। মধ্যম মানের একটি সুন্দর ফ্রক কিনে বাড়ির পথ ধরনেল।

বাড়ি ফেরার সময় একজন হুজুর তার রিকশায় আরোহণ করলেন। আরোহী মাওলানা হামিদুর রহমান সাহেব চালককে দ্বীনদার দেখে কিছু দ্বীনী কথা বলার সুযোগ পেলেন। কুশল বিনিময়ের পরে পরিবার নিয়ে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ রাস্তার পাশে এক মেয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। মেয়েটি তার মেয়ে নুসরাতের মতো দেখতে। চেহরা বিবর্ণ। কেশগুলো এলোমেলো। পরনের কাপড় মলিন। মন বিষণ্ন। মনসুর আলীর কোমল হৃদয়ে মায়ার উদ্রেক হলো। কানে বাজতে লাগল সেই বয়ান। যা তিনি দান ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া সম্পর্কে শুনেছিলেন। সেই আলেমের চেহারা ও নাম কিছুই স্মৃতিপটে সংরক্ষিত নেই। তার শুধু এতটুকু স্মরণ আছে, তিনি তার এলাকায় তাবলিগে এসেছিলেন। সেই ব্যক্তিই যে তার গাড়িতে উপবিষ্ট। এটা তিনি ধারণা করতে পারলেন না।

মনসুর আলী রিকশায় কড়া ব্রেক কষলেন। হুজুরের থেকে অনুমতি নিয়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুনলেন তার জীবন বৃত্তান্ত। মা অন্যের বাড়ি কাজ করে সংসারের টুকিটাকি খরচ চালায়। শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত। অপরাহ্নে কোনো ফুল বিক্রয় করে রোজগার করে মায়ের সাহায্য করে।

মনসুর আলীর মনের অবস্থা এমন যেন সাগরের উচ্ছল তরঙ্গমালার মাঝে দিগ্বিদিক-হারা পালহীন নৌকা। নিমিষেই সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের কথা ভুলে গেলেন। দানের ফজিলত বড় করে দেখতে লাগলেন। রিকশা থেকে ফ্রকটি নিয়ে পথশিশু মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন। সবকিছুই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন মাওলানা হামীদুর রহমান সাহেব। মেয়েটির অনাবিল সুন্দর হাসিতে দুজনেই মুগ্ধ।

রিকশা পুনরায় পূর্বের গতিতে ছোটাতে লাগলেন মনসুর আলী। খিদমাতুল খলক ফাউন্ডেশনের সক্রিয় কর্মী মাওলানা সাহেব কথায় কথায় জেনে নিলেন ঘটনার ইতিবৃত্ত। এটাও জেনে নিলেন তার বাসা কোথায়? তিনি কিছু একটা ভেবে ভাড়া একটু বেশি দিয়ে বিদায় নিলেন। মনসুর আলী একজন মহৎ দিলের আলেমকে দেখলেন।

ঈদের আর মাত্র এক দিন বাকি। নুসরাত জামার কথা জিজ্ঞাসা করল। বললেন আগামীকাল আনব। তুমি নতুন কাপড় পরে করে ঈদ করবে, ইনশাআল্লাহ। সকালে খুব দোয়া-কান্নাকাটি করে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফুরফুরে মনে রিকশা হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। যাত্রীর পরে যাত্রীকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিচ্ছেন, বেশ আয় হচ্ছে।

দুপুরে খাবার খেতে এসে মনসুর আলী দেখেন, তার ঘরে আনন্দের জোয়ার বইছে, দুই ছেলে নাসির ও নাসরুল্লাহর জামাকাপড়, মেয়ে নুসরাতের ফ্রক ও কিছু সজ্জাসামগ্রী, তার লুঙ্গী- গেঞ্জি, স্ত্রীর জন্য শাড়ি-কাপড়সহ ঈদের দিনের বাজার ও দুই হাজার টাকা খিদমাতুল খলক ফাউন্ডেশন থেকে এক হুজুর দিয়ে গেছেন। হুজুরের কথা শুনতেই তার মন আনন্দে উদ্বেলিত হলো। বিবরণ নিয়ে বুঝতে সক্ষম হলেন যে, গতকালের শেষ যাত্রী হুজুর এই ব্যবস্থা করেছেন। আনন্দে তার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। দুই হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করে দোয়া করলেন আল্লাহ তুমি এই ভালো মানুষের কল্যাণ করো। অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখো। এভাবে আরও অনেক দোয়া দিলো।

শিক্ষা: উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাখলুক কখনো মনের আশা পূরণ করতে পারে না, দুঃখ দূর করতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এগুলো সমাধা করতে পারেন। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা প্রত্যর্পণ করেন না। বিলম্ব হলেও অবশ্যই দান করেন।

দানে ধন কমে না বরং বাড়ে। যে মানুষের উপর রহম করে, আল্লাহ তার উপর রহম করেন। যে ব্যক্তি কোনো ভাইয়ের দুঃখ দূর করে এবং মুখে হাসি ফোটায়, একমাত্র আল্লাহর অসিলায় ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য, তাহলে আল্লাহ তার দুঃখ দূর করবেন ও মুখে হাসি ফোটাবেন।

কিছু মানুষ ধারণা করে যে, হুজুর-মাওলানারা শুধু গ্রহণ করে, প্রদান করে না। এই ধারণা ভুল। হুজুর-মাওলানারা অন্যদের মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে দেন না। দেন গোপনে। হুজুরদের মন আকাশসম উদার। তারা দান করে শুধু আল্লাহর কাছে প্রতিদান চায়। নাম, প্রসিদ্ধি, খ্যাতি আশা করে না। রাসুলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ এমনই ছিল।

আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসুল সা.-এর আদর্শে আদর্শিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

জামিয়া রাহমানিয়া আজিজিয়া, বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বাঁকা চাঁদের মুচকি হাসি

আমাতুল্লাহ ফাতেমা

বিস্তর মাঠে জটলা বেঁধেছে আবালবৃদ্ধবনিতা। সবাই অনুসন্ধানী চোখে আকাশপানে তাকিয়ে। পুঁচকেদের দলে ভিড় করেছে আমাতুল্লাহ, আফরা, সারা, সাদ ও সাইফ। নারিকেল গাছের ডগায় বাঁকা চাঁদের মুচকি হাসি প্রস্ফুটিত হলো। তা দেখে যেন আনন্দের বাঁধ ভেঙে জোয়ার এসেছে পুঁচকে-তরু-মনে। নিমন্ত্রণ পর্ব শেষে যে যার নীড়ে ফিরে গেল। আমাতুল্লাহর মন সকালের সূর্যিমামার সাথে ঈদ-আনন্দের অপেক্ষায় উশখুশ করছে। নূতন জুতা-জামা-প্রসাধনীতে সাজবে আমাতুল্লাহ। মাখবে ঈদ-আনন্দ। ঈদ উপলক্ষ্যে মাইকে মাইকে এনাউন্সম্যান্ট চলছে। জামাত প্রাঙ্গন 'আজমা মহিলা মাদ্রাসা ইদগাহ মাঠ'। সকাল নয় ঘটিকায়।

ইশার পর নামাজ, খাবার শেষে প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও সবাই তালিমে বসেছে। তালিম করবেন আমাতুল্লাহর আম্মু। আম্মু তালিমের প্রারম্ভিক কথা সেরে বললেন, আজকে তালিমের বিষয়বস্তু হলো, ঈদুল ফিতরের সুন্নাহ।

ঈদুল ফিতরের দিন ১৩টি কাজ করা সুন্নত। যথা–

১. অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা।
২. মিসওয়াক করা ও গোসল করা।
৩. নিজের সাধ্য অনুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করা।
৪. আতর-খোশবু ব্যবহার করা।
৫. ঈদের নামাজে যেতে অযথা বিলম্ব না করা।
৬. সাধ্য অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া করা।
৬. ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর, মিষ্টিদ্রব্য বা অন্যকিছু ভক্ষণ করা।
৭. ঈদগাহে গমনের পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করা।
৮. ঈদগাহে একপথে যাওয়া ও ফেরার সময় অন্য পথে আসা।
৯. অসুবিধা না থাকলে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।
১০. ঈদের নামাজ কোনো ময়দানে পড়া।
১১. যাওয়ার পথে নিম্নস্বরে তাকবির পড়া।

আল্লাহ আমাদের এর উপর সারা জীবন আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন— বলে তালিমের ইতি টানলেন আম্মু।

তালিম শেষে আমাত কচিমুখে বৈঠক থেকে উঠার দোয়া পড়ে নিলো। ঘুমানোর পূর্বে

মায়ের গলা জড়িয়ে জানতে চাইল সুন্নাহ কী, মা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন।

আসসলাতু খাইরুম মিনান নাউম-ধ্বনি শুনে আমাতের ঘুম ভাঙলে মাকে সে আবিষ্কার করল জায়নামাজে। সারারাত জেগে তিনি ইবাদাত করেছেন। আমাত-আয়েশা ওজু সেরে মায়ের পাশে নামাজে দাঁড়ালো। নামাজ সেরে মা তেলাওয়াত করছেন। আমাত-আয়েশা চোখ পিটপিটিয়ে মায়ের তেলাওয়াত শুনছে। ক্ষণপরে মা ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আয়েশা মায়ের পাশে মাকে সাহায্য করছে।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। আমাত একা ছলছল চোখ নিয়ে করিডোরে বসে আছে। এ ছলছল চোখযুগল দেখার কারও ফুরসত নেই।

আয়েশা মায়ের ফাইফরমাশ সেরে আমাতের পাশে এসে তাকে দেখে অবাক। ছলছল চোখের কারণ জানতে চাইতেই, অকপটে বলে দিলো

—জানো আপু, আমার না আজকে খুব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা মনে পড়ছে। শুধু মন বলছে আজকে যদি আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ঈদ করতে পারতাম? তবে খুব মজা হতো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ছোটদের খুব আদর করতেন, আমাকেও অনেক আদর করতেন। তাই না আপু?

—হুম, আমার পুঁচকে আপুটাকেও অনেক আদর করতেন।

—চলো আপু, আমরা নবিজি সা.-এর পছন্দের কাজগুলো করি, তাহলে নবিজি সা.-এর সাথে জান্নাতে থাকতে পারব।

আমাত জান্নাত সম্পর্কে জানে, জেনেছে তার মায়ের মুখ থেকে। তাই আমাতের মন খারাপের আকাশে যেন আশার আলো দেখা দিলো।

—আয়েশা, ছোটাপু, চলো। দেখি সারা কী করছে।

দু'বোন মিলে পাশের বাসার সারার কাছে গেল। সারা চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মন খারাপের কারণ বুঝতে পেরেছে আমাত-আয়েশা। ঈদে তার নূতন জামা হয়নি। আমাত তার তিনটি জামা থেকে সবচেয়ে সুন্দর জামাটি সারাকে দিয়ে দিলো। সারার মনে আনন্দ ঢেউ খেলে গেল। তা দেখে আমাত-আয়েশাও আনন্দ-সাগরে ডুব দিলো।

জান্নাতি এক অনাবিল আনন্দে পৃথিবী নামক গ্রহ যেন উচ্ছ্বসিত হলো।

মিরপুর আজমা মহিলা মাদ্রাসা, মিরপুর, ঢাকা।

চাঁদরাত

ইবনে আলাউদ্দিন

সন্ধ্যার পর থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেঘেদের ফাঁক গলেই ঈদের চাঁদ উঠেছে পুবাকাশে। প্রতিটা মুমিনের হৃদয় তাই ঈদের খুশিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নতুন নতুন সাজে সেজে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠেছে। সবাই ঈদের খুশিতে মেতে উঠলেও বড়বাড়ির পুকুরপাড়ে বিষণ্ন মনে বসে আছে ফারহান। নিত্যদিনের তার হাসিখুশি চেহারাটা আজ বড্ড মলিন। সবার মাঝে আনন্দের ধুম পড়লেও আজ তার ভীষণ মন খারাপ। তার এই মন খারাপির কারণ পাড়ার কারোরই অজানা নয়। প্রতিবছর চাঁদরাতের এই দিনটি এলেই সবার চোখে ভেসে উঠে রক্তে রঞ্জিত দুটো বীভৎস দেহ। রাস্তার ঠিক মাঝখানটায় ছিটকে পড়ে আছে। এ এক বেদনাদায়ক ঘটনার উপাখ্যান। সবার টনক নড়ে ওঠে।

আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগের এমনই এক চাঁদরাতের দিন। সেদিনও আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল মেঘেদের ভেলা। ঈদের খুশিতে মেতে উঠেছিল পাড়ার ছোট-বড়ো সবাই। সবার মাঝে ঈদের সে কী প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস। নবজাতক শিশু ও মাকে নিয়ে তখন হসপিটাল থেকে বাড়ি ফিরছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব জামিল সাহেব। আজ তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষের একজন। হবেনই তো। কারণ, এই শিশুপুত্র যে তাঁর যক্ষের ধন। হাজারো সাধনার ফসল। তাঁর বিনিদ্র রজনির চোখের অশ্রুর প্রতিদান। এ যেন শেষ বয়সে এসে বুড়ো ইব্রাহিম আ.-কে আল্লাহর দেওয়া ইসমাঈল-এর জীবন্ত ঘটনার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

এদিকে বাড়িতে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন জামিল সাহেবের বুড়ো বাবা-মা। কখন নাতির সোনামুখ দেখে প্রাণ জুড়াবেন। এ নাতিই যে বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ। এ যেন এক ঈদের মাঝে আরেক ঈদ। কিন্তু সেদিন নিয়তি যে ছিল তাদের প্রতিকূল, তা কেই-বা জানত! অপেক্ষা যে করছিল এক কঠিন মর্মান্তিক দুঃসংবাদ, তা কারই-বা জানা ছিল। খরস্রোতা নদীর মতো সময় যত বয়ে চলে, অজানা বিপদেরাও তত প্রকট হয়ে ঘনীভূত হয়।

সিএনজি করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে হাসি-আনন্দেই বাড়ি ফিরছেন জামিল সাহেব। সন্তানের মায়াবী চেহারা দেখে মায়ের মুখেও অঙ্কিত হয় মুচকি হাসির সরল রেখা। প্রসব-বেদনা যেন নিমিষেই মুছে যায় তার স্মৃতিপট থেকে। সন্তানের রাঙামুখ দেখতে পারা, এটাই তো পৃথিবীর সকল মায়েদের পরম আনন্দ ও অসীম সুখ।

হঠাৎ এক বিকট আওয়াজ শুনতে পায় রাস্তার আশেপাশে থাকা মানুষজন। দৌড়ে এসে দেখতে পায়, রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তমাখা দুটো বীভৎস লাশ। আধমরা হয়ে পড়ে আছে সিএনজি চালক। তার পাশেই হাউমাউ করে কাঁদছে নবজাতক শিশু। মালবাহী ট্রাকের চাপায় প্রাণ হারায় জামিল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী আমেনা বেগম। ঈদের আনন্দঘন দিন পরিণত হয় এক কালো দিনে। নিয়তি বড় নিষ্ঠুর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেদিন। আসলে, নিয়তির খেলা বোঝা বড় দায়। কখন কার অনুকূল কিংবা প্রতিকূল হয়ে ওঠে, তা কেউই জানে না। তবে সেদিন আল্লাহর অশেষ কৃপায় বেঁচে ফিরেছিল নবজাতক শিশু, আজকের ফারহান। পরবর্তী সময়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা সে তার দাদির মুখে শুনতে পায়। সেই থেকে চাঁদরাত এলেই শোকে কাতর হয় ফারহান।

করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

উৎসব

আবু বকর আরাফাত

নিঝুম রাত। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও কোনো আলোর ফুলকি চোখে পড়ছে না। গ্রামবাসীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নিশাচরও বোধহয় জেগে নেই। নিকশ অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। ঈদের বাঁকা চাঁদ থেকেও আলোর সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না। পথ চলতে হচ্ছে অনুমানের উপর ভিত্তি করে। পকেটে অবশ্য মুঠোফোন আছে। চাইলেই পারি লাইটটা জ্বালাতে। কিন্তু সে সাহস এখন হচ্ছে না।

আশপাশে কিছুদূর পর্যন্ত বাড়িঘরের কোনো অস্তিত্ব নেই। মোটামুটি একটা জঙ্গল আমাকে পাড়ি দিতে হবে। দুইপাশে বড় বড় জারুল গাছ আমার দিকে ঝুঁকে আছে। টেনে ধরবে কিংবা উঁচু করে নেবে এমন একটা ভাব। উভয় হাতেই সাইকেলটা নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে আমাকে। এমন নয় যে, আমি সাইকেল চালাচ্ছি। বরং সাইকেল হাতে নিয়েই দুর্দান্ত গতিতে সামনের দিকে পা ফেলছি। আমারও কিছুটা ভয় কাজ করছে। তবে এই ভয়ে খানিকটা আনন্দও আছে।

আমি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। অতিরিক্ত ভয় পেলে আমার পথ চলতে কষ্ট হয়। এরপর লক্ষ করলাম, আমি যে স্থানটাতে দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গাটা পুরো জঙ্গলের মাঝের একটা স্থান বলে ধরা যায়। একবার ভাবলাম জোরে একটা চিৎকার দেবো। তৎক্ষনাৎ মনে হলো তাতে কোনো লাভ হবে না। এই দুঃসময়ে কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। ফোনটা হাতে নিলাম। ডায়াল লিস্টে সর্বপ্রথম রায়হানের নম্বর। আমার ক্লাসমেট। বজ্জাত একটা। বর্তমানে খাগড়াছড়িতে আছে। সাত দিনের ট্যুরে গেছে। তাকে ফোন দিলেও বেশি একটা লাভ হবে না। খাগড়াছড়িতে অবস্থানরত একটা মানুষ কখনোই গাজীপুরের এক জঙ্গলে আটকে থাকা মানুষকে সাহায্য করতে পারবে না। তবুও তাকে ফোন দিলাম।

—হ্যালো!

ওপাশ থেকে সামান্য নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু কেউ কথা বলল না।

—রায়হান, বন্ধু, আমি একটা জঙ্গলের মধ্যে আটকে গেছি। তুই আমাকে বাঁচা।

—আমাজন না-কি আফ্রিকা? কোথায় আটকা পড়েছিস?

—দেখ, ফাইজলামি করিস না। আমার সত্যিই খুব ভয় লাগছে।

—তুই যা, জঙ্গলের আরও গভীরে প্রবেশ কর। খুব না লেখালিখি করস। যা, গিয়ে লেখার কিছু খোরাক নিয়ে আয়।

রায়হানের এমন কথায় আশপাশে একবার তাকালাম। একটু দূরেই কিছু একটা নড়ে উঠল। বেজিটেজি হবে হয়তো। চোখটাকে মুঠোফোনে নিবন্ধ করলাম। কিন্তু ধ্যান পড়ে রইল নড়াচড়ার শব্দের দিকে। হঠাৎ কেউ আমার চোখদুটো ধরে ফেলল দু'হাতে। বিকট শব্দে চিৎকার দিলাম। ফোনটা হাত থেকে কোথায় যেন ছিটকে পড়ল।

বড় হুজুর ছুটিতে ইমামতির দায়িত্বটা আমার কাঁধে ফেলে প্রায়ই বাড়ি চলে যান। তিনি একরকম অপেক্ষায়ই থাকেন, কবে আমার ছুটি হচ্ছে। আমার ছুটির দু-এক দিন আগে অগ্রিম একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। এবারও রোজার শেষে তা-ই করলেন। ২৭ রমজানে আসবো শুনে রেডি হয়ে থাকলেন। আমি যেদিন বাড়ি গেলাম, সেদিনই তিনি চলে গেলেন। আমারও এতে তেমন একটা বিরক্তি লাগে না, ইমামতি করতে বরং ভালোই লাগে। কিন্তু বাড়ি থেকে মসজিদ প্রায় দেড়-দুই কিলো দূরে। তাই ফজরের নামাজ পড়াতে একটু অসুবিধা; এই আরকি। তবুও অন্য কোনোদিন পথের এই দুর্গমতা নিয়ে এতটা খেয়াল করিনি। আজ এমন একটা কাণ্ড ঘটল।

হঠাৎ অনেক মানুষের চ্যাঁচামেচির শব্দ শুনলাম। হালকা চোখে তাকিয়ে দেখলাম জন পঞ্চাশেক মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ হাত-পায়ে তেল ডলে দিচ্ছে। কেউ আবার মাথায় পানি ঢালছে। আগে-পরের কোনো ঘটনাই স্বরণ করতে পারছি না। অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাদের কথাবার্তা শুনে কী হয়েছে না হয়েছে তার আগামাথা কিছুই বোঝা গেল না। একবার মন চাইল উঠে দেখি কী হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, এখন উঠলেই তারা আমার সেবা করা বন্ধ করে দেবে। তারচেয়ে বরং এভাবেই কিছুটা সময় পার করে দিই। হালকা করে চোখটা বুজে রাখলাম। পরে

জব্বার কাকার মোটা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

—আমি চোখদুইটা ধরছি। আর দেখি তোমার নাতি বেহুঁশ। পরে কান্ধে কইরা লইয়া আইছি।

কথাটা তাহলে দাদাকে বলা হচ্ছে। তারপরও কিছু কথাবার্তা শুনলাম। সবার কথা শুনে মনে হলো, আমি আমার বাড়িতেই আছি।

সবারই গোসল করা শেষ। ঈদগাহে যাবে ঈদের নামাজ পড়তে। গতরাতের পূর্ণ কাহিনি দাদু শুনলেন ঈদের দিন রাতে। আমি কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছিলাম সেদিন। বুড়ো বেটা জব্বার। আক্কেল-জ্ঞান হবে না বুঝি কোনোদিন। এই বুড়ো বয়েসেও ভীমরতি গেল না। বাচ্চা ছেলেদের মতো কাণ্ড করে বেড়ায় সবসময়। আমার ঈদের দিনটা মাটি করে দিলো। কিন্তু তারপরের দিনই আমার মনে ছোট্ট একটা প্রশ্ন জাগলো—ওই শেষ রাতে জব্বার কাকা জঙ্গলে কী করছিল?

তিনি এমন ইবাদতগুজার বান্দাও না যে মাসজিদ বা কোনো দরবারে গিয়ে ইবাদত করেন। তাহলে তিনি ওইখানে কী করছিলেন। শুধু আমি না, প্রায় সবারই একই প্রশ্ন। তারও কিছুদিন পর আমি আর রায়হান সে জঙ্গলে জব্বার কাকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বের করেছিলাম।

তিনি মনে হয় আমাকে বহুকষ্টে কাঁধে করে এনেছিলেন। ভাতিজার মায়াবী মুখের দিকে তাকিয়ে। নয়তো এখন আমি স্বর্গে থাকতাম। জব্বার কাকা বর্তমানে জেলে আছেন। আমি চাই বাকি জীবনটা তার জেলের কুঠুরিতেই কেটে যাক। কারণ প্রতিশোধের অনলে জ্বলে পুড়ছেন তিনি। কীভাবে যে জব্বার কাকার পুরো টিমকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম, তা আজও স্মরণ হলে বুকের মধ্যে কাটা হয়ে বিঁধতে থাকে। আমার একটি ঈদের রাত পুরো জীবনের জন্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান

প্রশ্নবোধক ঈদ উদ্‌যাপন

মোহাম্মদ লাবীব

ঝিঁঝি ডাকা সন্ধ্যা। আকাশে বাঁকা স্নিগ্ধ নতুন চাঁদের শুভ্র রেখা। আবালবৃদ্ধবনিতা কারও মনে আমেজের কমতি নেই। রাত পোহালেই ঈদের ঘনঘটা, সে কী আনন্দ, আহা! মায়েরা সন্তানদের নতুন কাপড় পরাচ্ছে, কেউবা মেহেদিতে হাত রাঙাচ্ছে। বড়রা ঈদগাহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। হরেকরকম আতরের ঘ্রাণে আজ সবকিছুই মোহিত। নানান স্বাদের খাবার আজ রান্না হচ্ছে ঘরে ঘরে, পেট ভরে তো চোখ ভরে না অবস্থা।

ছোট্ট ওয়াসী ফোকলা দাঁতের হাসি দিয়ে বুড়া দাদুকে সালাম দিয়েই অনুযোগের সুরে বলতে লাগলো, এবার আমার সালামি বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিবার শুধু দশ-বিশ টাকা দাও কেন? এবার হাত লম্বা করে পকেট থেকে বড় নোট বের করো।

এমন হাজারো গল্প ঈদের দিন আমাদের চোখে পড়বে, কত সুখ মানুষের জীবনে তা দেখতে পাব কিন্তু...।

ফিলিস্তিনের মুসলমানরাও কি এমন আনন্দঘন মুহূর্ত উপভোগ করবে? ফিলিস্তিনি ছোট্ট আবদুল্লাহ কি বাবার হাত ধরে ঈদগাহে আর যেতে পারবে? নববিবাহিতা আমেনা কি পারবে স্বামীর হাতে হাত রেখে কিছুক্ষণ সুখের গল্পে মেতে উঠতে? ওমর কি আজ ঈদের দিন হরেকরকমর সুস্বাদু খাবার খেতে পারবে? না-কি প্রতিদিনের মতো আজও পেটে পাথর বেঁধে অপেক্ষা করবে সুদিন ফিরবে এই আশায়! শিশু আহমেদের দুষ্টু-মিষ্টি হাসি কি আর তার বাবা-মা আজ উপভোগ করতে পারবে, না-কি গালে হাত রেখে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইবে?

সহস্র প্রশ্নবোধক ঈদ ছাড়া কিছুই কি উদ্‌যাপিত হবে ফিলিস্তিনে? না-কি তাঁদের রক্ত আর চোখের অশ্রুকণায় প্লাবিত হবে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড?

আমরা কেমন মুসলমান, ঈদের দিন ভরপুর আমোদে ফুর্তিতে মেতে থাকব, অথচ আমাদেরই ভাই জালেমের মিসাইলে ভূলুণ্ঠিত হবে, ইজরায়েলি হায়েনাদের ধর্ষণের রোষানলে পড়ে আমার বোন হাউমাউ করে কাঁদবে, ছোট্ট শিশু ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে থাকবে। তাদের লাশের স্তূপ উঁচু হবে, তাদের রক্তে ফিলিস্তিন প্লাবিত হবে, তাদের অশ্রুজলে বিরাট সাগর রচনা হবে আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব! এ-ই কি ছিল রাসুলে আরাবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা?

এ-ই কি ছিল المسلم اخ المسلمহাদিসের মর্ম? আমাদের শুধু তাদের জন্য ঘরে বসে দোয়া করলে হবে না, দোয়ার সাথে সাথে দাওয়াও (প্রচেষ্টা) চালাতে হবে এবং তা অতিসত্বর।

আল্লাহ ফিলিস্তিন মুসলিমদের বিজয় দান করুন, তাদের থেকে বিপদ আপদ দূরীভূত করুন ও সবরে জামিল দান করুন।

আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

এসো হে ভাই,

আমার ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের মুখে হাসি ফোটাই,
ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহকে আবার জাগাই।
মুহাম্মদ বিন কাসেম বেশে রনাঙ্গন আবার কাঁপাই,
বীরের দর্পে নির্যাতিত মুসলিম জাতিকে ফের বাঁচাই।
বিশ্ব হতে বিধর্মীদের ষড়যন্ত্র রুখতে অগ্রে ঘোড়া ছুটাই,
মুসলিম বিশ্ব কায়েম করতে উদ্যমী আপন হাত বাড়াই।
ঘরে বসে থাকা আর নয় আর নয়,
মোবাইলে কি আর বিশ্ব জয় করা যায়?
তলোয়ার হাতে নিয়ে মাঠে যেতে হয়,
তবেই বিশ্ব থেকে জুলুম বিদূরিত হয়।

মন আকাশে ঈদের চাঁদ

বেলাল বিন জামাল

আকাশজুড়ে মেঘেদের হাঁক। সাদা-কালো মেঘমালার ফাঁকে লাল লাল আলো ফোটে। গা-জুড়ে সকালের ঠান্ডা বাতাস বইছে। ভোরের পাখিরা এখনো জেগে ওঠেনি। সাহরি শেষে নামাজ পড়ে ছাদে এলাম। কোথাও কেউ নেই। পৃথিবী নীরবতায় ডুবে আছে। হয়তো বৃষ্টি হবে। মেঘেরা ছোটোছুটি করছে। ক'দিন পরেই মাদরাসা ছুটি হবে। হৃদয়ে বইছে ছুটির আমেজ। পরিচিতদের সাথে দেখা হবে। ঈদের আগে ঈদ হবে।

অনেকদিন পর মাদরাসা ছুটির এ বিষয়টি ছাত্র-জমানায় যেমন আনন্দের, উস্তায-জমানায় তা কষ্টেরও বটে। একে একে মনবাগানের ফুলগুলো বিদায় নিয়ে চলে যায় বহুদূরে। তাদের দূরত্ব আমাদের মনে কষ্ট দেয়। ভালোবাসার কষ্ট। সেদিন এক ছাত্র বিদায় নিতে এসে অশ্রু ঝরাল। ভালোবাসার অশ্রু। তাদের এই মুক্তাশ্রু আমাদের মনবাগান সিক্ত করে। ভালোবাসায় ঘেরা এই যে দূরত্ব; এতে মন যেমন কাঁদে, তেমনই দীর্ঘদিন পর গ্রামীণ বাতাসে মা-বাবাসহ পরিচিতদের মুখাবয়বে মন আকাশে ঈদের আগে চাঁদ ওঠে। সে চাঁদের সোনালি কিরণে সকল কষ্টের অবসান ঘটে।

এ ঈদের মায়াবী রেশ কেবল তারাই অনুভব করে, যারা থাকে দেশ, গ্রাম বা পরিবার থেকে বহুদূরে। দূর থেকে ছেলেমেয়েরা মনের ঘরে উঁকি মারে। মা-বাবাদের আদর মাখা কণ্ঠ ডাকে। পরিচিত অপরিচিতদের মায়া জড়ানো স্মৃতিরা কাঁদে। হায়াতের দিনগুলোতে তারা এই দূরত্বব্যথা নীরবেই রাখে। তাদেরই মন আকাশে ঈদের আগে চাঁদ ওঠে। চাঁদ ওঠার আনন্দমনে ছাদে যখন বসে আছি, তখনই শুরু হলো বৃষ্টি। যাকে বলে ঘুমবৃষ্টি। ঘুমোময় এই সকালে আর কিছু না ভেবে ঘুমঘোরে পাড়ি জমালাম।

উস্তায, জামিয়া ইসলামিয়া তা'লীমুল কোরআন খালপাড়, নারায়ণগঞ্জ।

ক্ষুধায় যে ছটফট করে তাকে জিজ্ঞাসা করো একটুকরো রুটির মূল্য! পিপাসায় প্রাণ যার ওষ্ঠাগত তাকে জিজ্ঞাসা করো এককাতরা পানির মূল্য।

অন্যরকম ঈদ

মাহফুজ রুমান খান

এক. আন্তিকা এ বছর ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে টপার হয়ে সপ্তম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। স্কুলের ছাত্রীরা সবাই তাকে সমীহ করে চলে। মেধাবী হওয়ায় স্যার-ম্যাডামরাও তাকে ভালোবাসে। আন্তিকার জন্ম ইট-পাথরের ঘেরা শহরে। সেই সুবাদে গ্রামে তার যাওয়া হয়নি। তবুও তার অনেক প্রিয় গ্রাম। মামাতো বোন ফারিয়ার কাছ থেকে সে গ্রামের নানান ঐতিহ্যের কথা জানতে পারে। গ্রামের সবুজ বন, লতাপাতা সে কেবল বই-পুস্তকই দেখেছে। তার খুব ইচ্ছে এই ঈদ যেন তার নানার বাড়িতে কাটে। কী করে যে তার বাবার কাছে সে তার মনের কথা বলবে, তার কূল-কিনারা পাচ্ছে না। তার সব আবদার বাবার কাছেই করে। তার ইচ্ছেগুলো মা এড়িয়ে যায়। মেয়েরা তাদের আবদারগুলো বাবার কাছেই বলে। সাধারণত মেয়েদের প্রতি বাবার আলাদা মায়া আছে। কিন্তু এখন আন্তিকা নিশ্চিত না, তার বাবা এই আবদার রাখবেন কি-না।

দুই. আন্তিকা সকালে এক কাপ চা নিয়ে বাবার রুমে যায়। চা খেতে খেতে বাবা বললেন কিছু বলবা আন্তিকা?

তেমন কিছু না আব্বু। রমজান মাস তো প্রায় শেষ হতেই চলল। আন্তিকার কথা শেষ না করতেই বাবা শপিংয়ের কথা বললেন।

—আচ্ছা তোমাকে আগামী শুক্রবারে নিয়ে যাব।

—না আব্বু।

—তবে কী বলো?

আচ্ছা আব্বু এবারের ঈদ নানুবাড়ি করলে কেমন হয়? আমার অনেক ইচ্ছে ঈদটা যেন নানুবাড়িতে হয়।

আপনি বলেছিলেন পরীক্ষায় ফাস্ট হলে যা আবদার করি, তা-ই রাখবেন। আব্বু এটা আমার আবদার।

সাধারণত ভোরবেলা মানুষের মন থাকে ফ্রেশ। মানসিকভাবে মানুষ ভোরবেলা অনেক শান্তিতে থাকে। সে কারণে হয়তো আন্তিকার বাবা রাজি হলেন।

তিন. ঈদের এক দিন পূর্বে তারা সকল কাজ গুছিয়ে ফেলল। পরের দিন তার মা আন্তিকাকে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্য রওনা হলো। আন্তিকার বাবা ব্যবসার কাজে থেকে গেলেন। তিনি কাজ শেষ করে খুব শিগ্‌গিরই আসবেন। অনেক অপেক্ষার পরে আন্তিকা প্রবেশ করল এক অজপাড়া গাঁয়ে। গ্রামের মেঠোপথে হেঁটে নানুবাড়ির দিকে যাচ্ছে মা ও মামার সাথে। আন্তিকার মামা তাদের রেলস্টেশন হতে রিসিভ করেন। আন্তিকা অবাক হয়ে দেখে গ্রামের মেঠোপথের অপরূপ সৌন্দর্য্য। রাস্তা নেই,

বড় গাড়ির যানজট নেই, নেই গাড়ির শব্দ। মরুভূমি ন্যায় নির্জীব এলাকা। আন্তিকা মনে মনে ভাবল, এখন মনে হয় মধ্যরাত। তাই মনে হয় নেই শহরের জামেলা। আন্তিকা তার ঘড়ির কাঁটার তাকাল, কিন্তু তার ভাবনা সত্যি না। এখন মাত্র ১.৩০ বাজে।

আন্তিকার পেটের ভেতরে ক্ষুধা পেট ঝালাপালা শুরু করেছে। রেলস্টেশনে থেকে নেমে মামার সাথে গঞ্জের হোটেলে ইফতার করেছিল। এখন আবার খিদে পেয়েছে। সারাদিন রোজা রেখে হালকা খাবারে কী হয়? আন্তিকা প্রত্যেকটি রোজা রেখেছে। সবগুলো রোজা আজ পূর্ণ হলো। রাত পোহালেই ঈদ। আহা, কী আনন্দ!

হাঁটতে হাঁটতে আন্তিকা নানুবাড়িতে চলে এলো। কুশল বিনিময়ের পর তারা ফ্রেশ হয়। তারপর খাওয়াদাওয়া করে আন্তিকা তার মা, মামি ও ফারিয়ার সাথে গল্প করতে বসে পড়ে। আজ ঈদের আগের দিন। তাই সবাই সজাগ থেকে গল্প করছে। এমন সময় মামা ফারিয়াকে বলে, এই নাও মেহেদি, আন্তিকার হাতে লাগিয়ে দাও। আন্তিকা অনেক খুশি, এই প্রথম সে গ্রামে ঈদ করবে। সকালে সে অনেক মজা করবে।

চার. ফারিয়ার ডাকে আন্তিকার ঘুম ভাঙল। ফজরের সালাত শেষ করে আন্তিকা ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়।

কিন্তু ফারিয়া লোভ দেখায় এখন ঘুমিয়ে পড় না। একটু পরে শুনতে পাবে নানান পাখির শব্দ, যা শুনতে অনেক রোমাঞ্চকর। সত্যিই কিছুক্ষণ পার না হতেই শুরু হলো হরেকরকম পাখির ডাকা-ডাকি। প্রথমে কানে বাজলো কু-কু, চি-চি আওয়াজ, যা আসলেই অনেক রোমাঞ্চকর। বাহির থেকে হালকা আলোর আভাস আসছে। আন্তিকা জিদ ধরল চলো বাহিরে যাই। ফারিয়া আন্তিকাকে শিয়ালের ভয় দেখায়। বলে এখনো সূর্য ওঠেনি। আরও ফর্সা হোক, তারপর যাব। এখন বের হলে শিয়াল মামা হামলা করবে। শিয়ালের উৎপাত আমাদের গ্রামে বেশি। তবুও আন্তিকার জিদ তাকে হার মানালো। তারা ঘর থেকে বের হয় সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল খালি পায়ে। যা আন্তিকার কাছে অনেক আনন্দ লাগল। তারা মেঠোপথে হাঁটছে তো হাঁটছেই।

কিছুক্ষণ পর চারিদিকে আনন্দের ধুম।

পাঁচ. আজ পবিত্র ঈদুল ফিতর; সবাই খুশি। সারা গাঁয়ে হইচই। সবার মুখে আনন্দমাখা হাসি। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা পুকুর ঘাটে একসাথে সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। এদিকে আন্তিকার মামি হরেকরকম পিঠে ভেজেছে। আন্তিকা তো অনেক পিঠের নামই জানে না। এক এক পিঠায় একেক রকম স্বাদ। আন্তিকা তার বয়সে এমন স্বাদ পেয়েছে কি-না তার জানা নেই। সারা গ্রাম আনন্দে থইথই করছে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা আনন্দে গান গাইছে।

ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ,
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানি তাগিদ।

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

ওদের ঈদ

আব্দুল আহাদ

আমরা করি আরাম-আয়েশ
নরম তুলোর খাটে,
মুখে ফোটাই কথার ফুলও
মাস্তিতে দিন কাটে।

ওরা করে জীবন যুদ্ধ
এ জাতির গৌরবে,
ওদের মুখে ফুটবে হাসি
বলো আবার কবে?

ঈদ এসেছে বছর ঘুরে
আমরা সবাই খুশি,
ওদের কাছে আসে না ঈদ
ওরা কি তাই দোষী?

আমাদের ঈদ সেমাই-চিনি
খানাপিনার ঢেউ,
ওদের ঈদে নেমে আসে
একটু বাঁচে কেউ।

ঈদের খুশি

মুহাম্মাদ ছিদ্দিকুর রহমান

চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে
ঈদের খুশি নিয়ে,
ঈদের নামাজ পড়বে সবে
ঈদের মাঠে গিয়ে।

সেমাই পায়েস ঘরে-ঘরে
সবাই মিলে খাবে,
গরিব দুঃখী আছে যারা
তারাও দাওয়াত পাবে।

জাকাত ফিতরা পৌঁছে দেবো
নিঃস্ব জনের ঘরে,
মহান আল্লাহ খুশি হবেন
তোমার কাজের তরে।

নিজের বাড়ি কোর্মা পোলাও
পাশের বাড়ি খিদে,
নারাজ হবেন আল্লাহ মোদের
এমন করলে ঈদে।

ধনী গরিব নাই ভেদাভেদ
এমন খুশির দিনে,
নতুন নতুন জামা কাপড়
আনছে সবে কিনে।

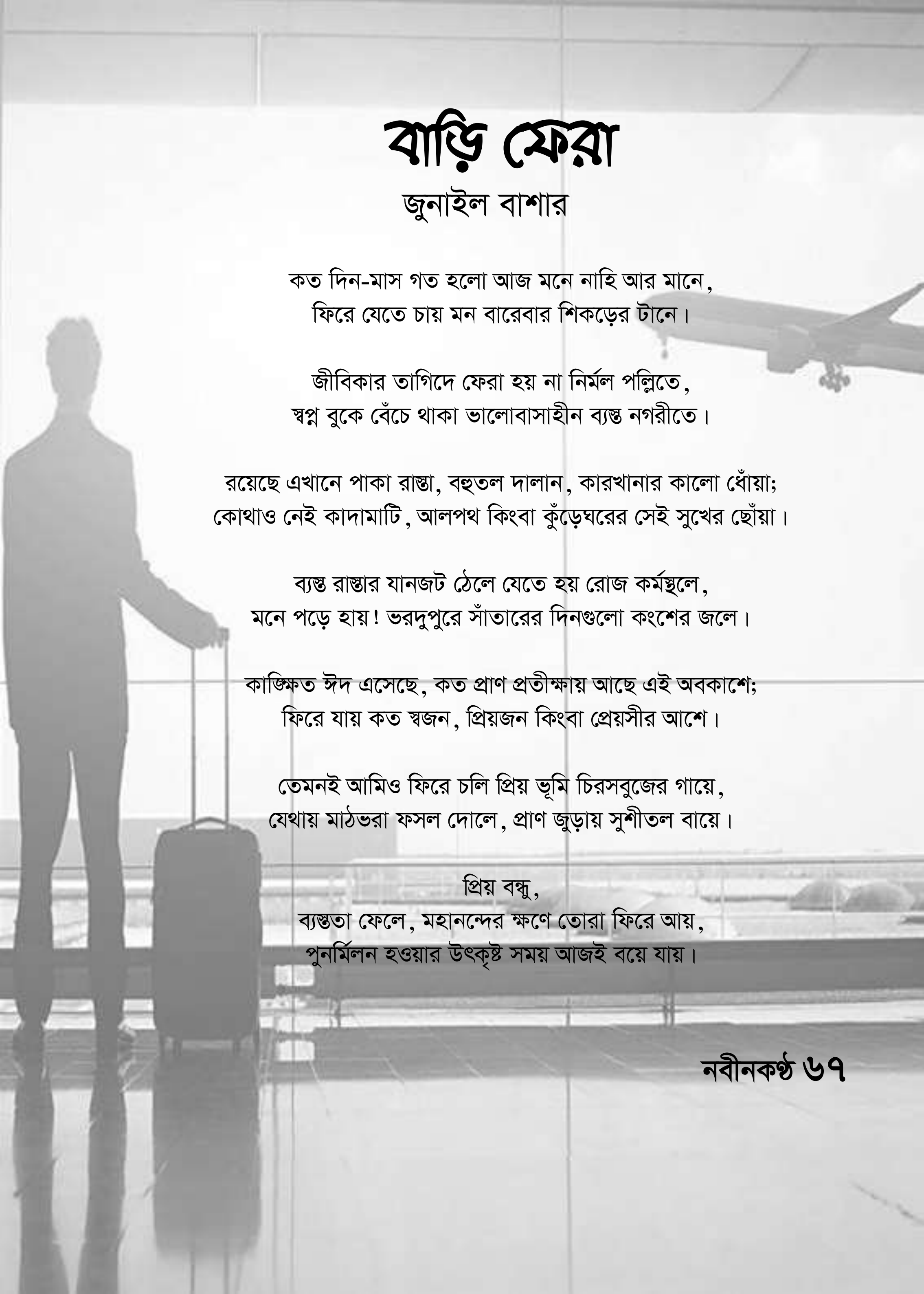

বাড়ি ফেরা

জুনাইল বাশার

কত দিন-মাস গত হলো আজ মনে নাহি আর মানে,
ফিরে যেতে চায় মন বারেবার শিকড়ের টানে।

জীবিকার তাগিদে ফেরা হয় না নির্মল পল্লিতে,
স্বপ্ন বুকে বেঁচে থাকা ভালোবাসাহীন ব্যস্ত নগরীতে।

রয়েছে এখানে পাকা রাস্তা, বহুতল দালান, কারখানার কালো ধোঁয়া;
কোথাও নেই কাদামাটি, আলপথ কিংবা কুঁড়েঘরের সেই সুখের ছোঁয়া।

ব্যস্ত রাস্তার যানজট ঠেলে যেতে হয় রোজ কর্মস্থলে,
মনে পড়ে হায়! ভরদুপুরে সাঁতারের দিনগুলো কংশের জলে।

কাঙ্ক্ষিত ঈদ এসেছে, কত প্রাণ প্রতীক্ষায় আছে এই অবকাশে;
ফিরে যায় কত স্বজন, প্রিয়জন কিংবা প্রেয়সীর আশে।

তেমনই আমিও ফিরে চলি প্রিয় ভূমি চিরসবুজের গায়ে,
যেথায় মাঠভরা ফসল দোলে, প্রাণ জুড়ায় সুশীতল বায়ে।

প্রিয় বন্ধু,
ব্যস্ততা ফেলে, মহানন্দের ক্ষণে তোরা ফিরে আয়,
পুনর্মিলন হওয়ার উৎকৃষ্ট সময় আজই বয়ে যায়।

ঈদ এসেছে

ইফতেখার জামান সাজারিয়া

দূর আকাশে এক ফালি চাঁদ
জানান দিলো আজ,
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
সাজও নতুন সাজ।

ঈদের দিনে সবাই মিলে
ঈদগাহেতে যাও,
নামাজ শেষে হাসি মুখে
ঈদের নাশিদ গাও।

নিসাব সমান মালের জন্য
জাকাত দাও সবাই,
ফিতরাটুকু করলে আদায়
রয় না বিভেদ ভাই।

ঈদের খুশি দাও ছড়িয়ে
সবার মাঝে আজ,
নতুনভাবে শপথ করো
গড়তে সুখের রাজ।

ঈদ মানে

জাহিদ বিন মোস্তফা

ঈদ মানে হাসি খুশি
সবাই একই সাথে,
ঈদ মানে মজা করা
হাতে ধরে হাতে।

ঈদ মানে ভুলে যাওয়া
মনে থাকা ব্যথা,
ঈদ মানে প্রকাশ করা
মজার কিছু কথা।

ঈদ মানে নতুন কিছু
একটি বছর পরে,
ঈদ মানে খুশির বার্তা
সবার ঘরে-ঘরে।

ঈদ মানে ঘুরতে যাওয়া
ভালো কোনো স্থানে,
ঈদ মানে ফুর্তি আমোদ
আনন্দ খুব প্রাণে।

মানবিকতায় শ্রেষ্ঠ

প্রহ্লাদ কুমার প্রভাস (Pk)

রমজানের ওই মাস কাটিয়ে ঈদ আসে,
অনাবিল খুশি নিয়ে।
নীতিকে ধর্ম মানো, মনুষ্যত্ব জাগ্রত করো,
সাথে চলো দুর্দশাগ্রস্তদের নিয়ে।

দিন-রাত নামাজ, যতই সাজো ধর্মীয় সাজ, হবে না তাতে প্রভু খুশি।
হৃদে মানবিকতা, না থাকে যদি ধার্মীকতা,
যতই পড় নামাজ দেখে রবি শশী।

দিনে কত করছ পাপ, এক ঈশ্বর দেখছেন সব, ধুইবে না তা হাজারও ধর্মীয় সাজে।
তজবি, মালা যতই জপো, ঈশ্বরকে নাহি ভজো বিফল হবে সকল কাছে।

ঈদের এই খুশির দিনে, সাহায্য করো যারা থাকে আহার বিনে।
দুস্থকে দাও সেবা, বস্ত্র দাও বস্ত্রহীনে।

ঈদ মানে ঘোরাঘুরি আর ধর্মীয় সাজ নয়।
চলো যদি এক হয়ে সকলকে সাথে নিয়ে, তবেই আসল নেকি প্রাপ্তি হয়।
অসহায়ের পাশে থাকো, ঈশ্বরের সঙ্গ ধরো হইও না কভু পথভ্রষ্ট।
মনে রেখ অর্থ, ক্ষমতা, সবকিছু বৃথা মানবিকতায় শ্রেষ্ঠ।

ঈদের খুশি

মুহাম্মদ মুকুল মিয়া

মুখের হাসি প্রাণের খুশি
মনের ভালোবাসা,
ঈদ এসে ভরিয়ে দেয়
আমার সকল আশা।

নতুন জামা পেয়ে আমার
মনে জাগে সুখ,
মায়ের হাতের ফিরনি দিয়ে
করি মিষ্টি মুখ।

আতর-খোশবু-সুরমা মেখে
ঈদগাহেতে যাই,
মহান রবের কাছে আমি
তাইতো ক্ষমা চাই।

হিংসা-বিভেদ ভুলে গিয়ে
কোলাকুলি করি,
দুঃখ-জরা-ব্যথা ফেলে
সুখের জীবন গড়ি।

এমন খুশির সুখের দিনে
ঈদকে বাসি ভালো,
ঈদ এসে দূর করে দেয়
মনের যত কালো।

ঈদে যাব বাড়ি

গাজী আরিফ মান্নান

ঈদের আগে যাবই আমি
আমার গ্রামের বাড়িতে,
লঞ্চে-ট্রেনে, বাসে-ট্রাকে
কিংবা লাশের গাড়িতে।

হাজার কিলো পথ হাঁটিবো
আমি বেকুব গাধা,
যতই আসুক বিপদ-আপদ
কিংবা কোনো বাধা।

যাবই যাব, যাবই আমি
আমার মায়ের কাছে,
সেথায় আমার বন্ধু-বান্ধব
পাড়া-পড়শি আছে।

ভাগ্য আমার লেখা আছে
উপরওয়ালার হাতে,
ঈদ আনন্দ ভাগ করিব
হয়তো সবার সাথে।

ঈদের খুশি

রাশেদ নাইব

ঈদ এলে হেসে ওঠে
ফুল পাখির দল,
হেসে ওঠে নীল আকাশ
নদী তরু ফল।

সবুজের সমারোহ
মাঠ হেসে ওঠে,
হেসে গেয়ে নদীগুলো
দূর পানে ছোটে।

খোকা হাসে খুকি হাসে
চাঁদ হাসে রাতে,
ঘাসের বুকে শেফালিটা
হাসে সাথে সাথে।

রোজার শেষে ঈদের আমেজ
প্রাণে ওঠে ঢেউ,
গরিব দুঃখীর থাকব পাশে
বাদ যাব না কেউ।

ঈদের আমেজ

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

ঈদের খুশি ঘরে ঘরে
চাঁদ উঠেছে ওই,
খুব খুশিতে শিশুরা তাই
করছে হইচই।

হাসছে শিশু হাসছে বুড়ো
সবাই খুশি বেশ,
সবার মাঝে ছড়িয়ে গেছে
আনন্দ আবেশ।

ছোট-বড় ধনী-গরিব
সবার মুখে হাসি,
ঈদের খুশি চারিদিকে
ছড়াক রাশিরাশি।

ঈদের বাঁকা চাঁদ

রবিউল হাসান আরিফ

রমজানেরই রোজার শেষে উঠলো ঈদের চাঁদ,
পুব আকাশে চাঁদ উঠেছে ঈদের বাঁকা চাঁদ।
খুশির জোয়ার বইছে দেখো ধরার বুকে আজ,
সেই খুশিতে মাতোয়ারা আমরা সবাই আজ।
আয়রে শিশু আয়রে কিশোর চলরে ছুটে যাই,
দলবেঁধে তাই পড়তে সালাত ঈদগাহেতে যাই।

সালাত শেষে যাব মোরা প্রতিবেশীর বাড়ি,
সালাম কালাম মুসাফাহা করব তাড়াতাড়ি।
নিঃস্ব যারা বঞ্চিত যারা তাদের খবর নেব,
আমার ঈদের আমেজ যেন তাদের পানে দেবো।
খুশির দিনে দেশের বাড়ির দিগ্‌বিদিকে ছুটি,
সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠি।

খুশি যেন আকাশ ছোঁয়া মুমিন হৃদয়ে,
নতুন কাপড় নতুন কিছু পড়ব যে গায়ে।
ঈদের দিনে নানার বাড়ি বিষণ ভালো লাগে,
খালামণির আদর আমায় টানে সবার আগে।
ঈদ সালামির মজা যেজন পেয়েছে যে একবার,
ইচ্ছে প্রবল তাই তো বুঝি বেড়াতে খোকা-খুকির।

গরিবের ঈদ

রুকাইয়া তাসনীম

আজ ঈদ সবার গায়ে নতুন জামার বাহার,
কিন্তু ব্যস্ত গরিব ছেলেটি জোগাতে মায়ের আহার।
ছ'মাস যাবৎ ভুগছে রোগে তার আপন মা,
মা ছাড়া তার এই দুনিয়ায় নেই যে ঠিকানা।

মায়ের ঔষধ করতে জোগাড় নেমে পড়ে রাস্তায়,
কখনো রিকশা কখনো ঠ্যালার পাছে ঠ্যালে যায়।
ছ'মাস আগে তারও চোখে কত স্বপ্ন ভাসতো,
ঈদের দিনে সেও খুশিতে সবার সাথে হাসতো।

স্বপ্ন এখন একটি কেবল দিবা-রাতে ভাসে,
আগের মতো মা যেন আবার মুচকি ঠোঁটে হাসে।
সবাই যখন ঈদের খুশিতে গাইছে ঈদের গীত,
রিকশা ঠ্যালে কাটছে তখন এই গরিবের ঈদ।

ঈদের দিনে

এইচ. এম. মাহমুদুল হাছান

ঈদ নিয়ে লিখছি ছড়া
আজকে তাদের জন্য,
এই সমাজতন্ত্রে গরিব যারা
টোকাই বলে গন্য।
ঈদের দিনে মোরা সবাই
করব খুশি কত,
ক্ষুধার জ্বালায় দেখ তারা
কাঁদছে যে অবিরত।

ধনীরা সব হাতটি বাড়ান
ওদের প্রতি আজ,
পোশাক খাবার দিয়ে গড়
সাম্য-প্রীতির রাজ।

বায়না

রুশো আরভি নয়ন

চাঁদ উঠেছে নীল আকাশে
ঈদ এসেছে ওই,
মাগো আমার এবার ঈদের
নতুন জামা কই?

কোথায় মাগো মিষ্টি পায়েস
পোলাও ভাতের হাঁড়ি,
দাও না গো মা জলদি করে
নয়তো করব আড়ি।

কাঁদো কেন মুখ লুকিয়ে
শাড়ির আঁচল তলে?
তুমি কি মা রাগ করেছ
বায়না ধরছি বলে?

পরব না মা নতুন জামা
খাব না আজ কিছু,
তবুও তুমি আর কেঁদো না
ধরব না আর পিছু।

কবে মাগো সবার মতো
ঘুচবে সকল দুখ,
আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে মা
আসবে ফিরে সুখ!

মিলবে খোকা সুখের দিশা
সবুর করো আজ,
পরের ঈদে সেজো তুমি
মনের মতো সাজ।

খুশির ঈদ

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

রোজার শেষে চাঁদ উঠেছে
আকাশ কোণে ওই,
সেই খুশিতে খোকাখুকুর
লেগেছে হইহই।

ঘুম যেন নেই কারও চোখে
স্বপ্ন দেখে তারা,
নতুন জামা পেয়ে তো সব
সবাই আত্মহারা।

পড়বে নামাজ ঈদগাহেতে
হাত দুখানা তুলে,
দুঃখ ব্যথা কষ্টগুলো
সবই যাবে ভুলে।

রোজার শেষে বছর বছর
ঈদটা আসুক ফিরে,
সবার মনে হাজার খুশি
ঈদ আনন্দ ঘিরে।

ভাগ করেছি ঈদের খুশি

আলমগীর কবির

বোনের ঠোঁটে খুশির ঝিলিক
হাসি মায়ের মুখে,
খুশির রঙে রঙিন সকাল
ঢেউ তুলে যায় বুকে।

গায় পাখিরা গান খুশিতে
ফুল ছড়ালো ঘ্রাণও,
আজকে আমি ভীষণ খুশি
মা তুমি কি জানো?

বোনের সাথে খুঁনশুটি আর
নেইকো অভিমানও,
আজকে আমি খুব সেজেছি চাঁদ
হবে ঠিক ম্লানও।

আজকে খুশির ঈদ জানি মা
আজকে খুশির ঈদে,
রাজুর মুখের মলিন হাসি
বুকে এসে বিঁধে।

চাই না আমি রাজুর চোখে মান
অভিমান কান্না,
ভাগ করে নিই ঈদের খুশি
তোমার হাতের রান্না।

বাসায় দাওয়াত করে তাকে
ভাগ করে দিই খাবার,
সাম্য সুখের দিন এসেছে
বছর ঘুরে আবার।

গলাগলি ধরে দুজন
ঈদগাহে যাই হেসে,
পাখির মতো মেলি ডানা
হাওয়ায় ভেসে-ভেসে।

বাঁকা চাঁদের হাসি

শামসুল আরেফীন

দূর আকাশে উঠল ভেসে
বাঁকা চাঁদের হাসি,
সেই খুশিতে আমরা সবাই
ঈদ আনন্দে ভাসি।

ঈদের আমেজ ঈদের খুশি
থাকুক সবার দিলে,
ধনী-গরিব পড়ব নামাজ
এক কাতারে মিলে।

নামাজ শেষে বাড়ি এসে
ফিরনি পায়েস খাবো,
গরিব দুঃখী অনাথ পেলে
সেবার হাত বাড়াবো।

পথশিশুর ঈদ

সায়রা নূর মারইয়াম

অর্থের মহোর্মিতে ভেসে কিনছি মোরা উচ্ছ্বাস হর্ষ,
কেনাকাটার হিড়িক ফেলেছি পারলে কিনছি যেন পুরো পণ্যগৃহ!
আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে পথশিশু, নিষ্ফলা আবেগে মোছে নেত্রবারি,
কারণ তারা দুর্দশাগ্রস্ত, নিঃস্ব।

আকাঙ্ক্ষা তো তাদেরও জাগে সুশোভন পোশাকে ঘুরতে,
দলবেঁধে নামাজে যেতে;
অথচ তাদের দেখা যায় ফুটপাতে ছেঁড়া জামা গায়ে,
বিন্দুমোচনে মন হাসিয়ে প্রখর রৌদ্রে খালি পায়ে।

আমরা কি গড়ে দিতে পেরেছি তাদের সেই মেদিনী?
যা ছিল তাদের কাম্য, অধিকার আমাদের প্রতি।
পারিনি তো আমরা!

এই ঈদ-ই হবে পথশিশুর তৃপ্তি উল্লাস,
যদি আপনি, আমি, আমরা
তাদের একটু সাহায্য করি।

ছড়াক সবার মাঝে

আবু ইউসুফ সুমন

জানান দিলো ব্রেকিং নিউজ
চাঁদ মামাটা হেসে,
যাচ্ছে বয়ে খুশির জোয়ার
ঈদ হবে কাল দেশে।

হাজির হয় ঈদ প্রতিবার
সাম্য-প্রীতির গানে,
গরিব-ধনীর বিভেদ মোছার
উদাত্ত আহ্বানে।

হয়ে উঠে ঈদ স্পেশাল
ছোটো-বড়োর মনে,
ফিরনি পায়েস নানান পিঠা
আছে আকর্ষণে।

Eid Al Fitr Mubarak

ঈদের দিনে

মুহাম্মদ এমদাদুল হক

আকাশের ওই নীলের দেশে
হাসে বাঁকা চাঁদ,
ধনী গরিব এক কাতারে
মিলাই কাঁধে কাঁধ।

সবার ঘরে ফিরনি পায়েস
একই খাবার আর,
দুঃখীর ঘরেও সুখের হাসি
খুশির ভাগীদার।

ভালোবাসা দিই ছড়িয়ে
প্রাণ থেকে সব প্রাণ,
কণ্ঠে ঝরে আজকে সবার
সুখ সমতার গান।

ছোট বড় মিলেমিশে
নাই যে ভেদাভেদ,
বিভেদ বিবাদ ভুলে হৃদয়
করছে যে সফেদ।

হাসিমুখে বুকে বুকে
মিলাই সবাই বুক,
খুশির বানে মন কাননে
ভুলে সকল দুঃখ।

মুমিন হাসুক প্রাণে-প্রাণে
সকল ভালো কাজে,
ঈদের শিক্ষা ঈদের খুশি
ছড়াক সবার মাঝে।

ঈদ মানে

তামীম আহমদ সাদী

ঈদ মানে তো হাসি খুশি
একটি সুখের ক্ষণ
পারস্পরিক ভাব বিনিময়
ফুরফুরে তনু-মন।

ঈদ মানে তো সবার মাঝে
ছড়িয়ে পড়ে সুখ,
কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে
যায় ভুলে সব দুঃখ।

আমির ফকির এক কাতারে
সিজদাতে হয় নত,
কায়মনেতে চায়রে ক্ষমা
যার অপরাধ যত।

দিলগুলো সব অশ্রুজলে
করতে ধুয়ে সাফ,
প্রভুর আশিস পেতে মাঁগে
দুহাত তুলে মাফ।

ঈদ মানে তাই খুশির আমেজ
খোকাখুকির সাজ,
নতুন কাপড়, নতুন জুতোর
বায়না তাদের আজ।

ঈদ এসেছে

আবরার নাঈম

আকাশের বুকে চাঁদ হেসেছে,
রমজান শেষে ঈদ এসেছে।
মুমিন হৃদে খুশির জোয়ার,
খুলছে সবাই প্রীতির দুয়ার।

পিঠা-পুলি ফিরনি পায়েস,
খেয়ে সবাই করছে আয়েশ।
জান্নাতি সাজে দলে দলে,
ঈদের মাঠে যাচ্ছে চলে।

এক কাতারে পড়তে সালাত,
সালাত শেষে মোনাজাতে।
ক্ষমা চায় মুমিন অশ্রুপাতে,
মহান রবের প্রেম দরিয়ায়।

মন খারাপের প্রশান্তি

★ **মাসুমা সাঈদা**

১৩ই মার্চ, ২০২৪। সময়টা রমজানের। সকাল থেকেই আপুর বাসায় যাওয়ার তোড়জোড় চলছে। সকল প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড শেষ করে অবশেষে আমরা বের হলাম। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। রাস্তায় নেমে মনমতো কোনো রিকশার দেখাই পাচ্ছিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা পাওয়া গেল। কাছে গিয়ে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতেই প্রত্যুত্তর করল সে ঠিকানা চেনে না। চিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাকে। ভাড়া কত প্রশ্ন করায় ফিরতি উত্তর দিলো, যা দিয়ে আসেন তা-ই দেবেন। আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লাম। রোদে মাথা ধরে যাচ্ছিল, হুডটা টেনে দিতে বললাম। রিকশা চলতে শুরু করল। পথের দু'পাশের সবুজের বিস্তৃতি দেখে খুব ভালো লাগছিল। ইদানীং সবুজ দেখলেই খুব ভালো লাগে। সবুজের প্রেমে পড়ে গেছি বোধহয়। রিকশায় আমরা দু'বোন ছিলাম। সারি সারি সবুজ দেখতে দেখতে নানান বিষয়ে কথা বলতে বলতে আমরা যাচ্ছিলাম। তখন রিকশার হুড টেনে দেওয়ায় রোদের তেজ অনুভব হচ্ছিল না।

দুপুর এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা। রিকশা চলছে তার নিজ গতিতে, গন্তব্য আপুর বাসা। রিকশাচালক ভাইটি খুব কষ্ট করে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। একে তো তিনি আমাদের গন্তব্যের ঠিকানাটা চিনেন না, তার উপর চারিদিকে এত এত গলি দেখে আমরাও বিভ্রান্ত। পাশে বসে থাকা আমার বোন তাকে বলল কাউকে জিজ্ঞেস করে নিতে। এতে পথ চলতে সুবিধা হবে। সে বোধহয় শুনতে পেল না। বেশ কয়েকবার বলার পর সে শুনতে পেল। অন্যদের বারবার জিজ্ঞেস করেও বেশ হয়রান হচ্ছিল।

এদিকে রোদের তেজ ক্রমেই বেড়ে চলছে। রিকশাচালক ভাইটির নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। রিকশায় ওঠার পর থেকেই তার প্রতি সহানুভূতি কাজ করছিল। ভাইটির বয়স কত আর হবে? এই ঊনিশ-বিশ এর কোঠায়। গড়ন চিকন-চাকন, পেটানো শরীর। রোদের তীব্রতায় প্রচণ্ড ঘামে ভিজে গিয়ে পিঠের গেঞ্জি একেবারে চপচপা গেছে। কপাল বেয়েও টপটপ ঘামের ফোটা ঝরছে। তবুও অক্লান্ত পরিশ্রম করে পায়ে চালিত রিকশা চালাচ্ছে। এই মানুষগুলো দেশের প্রতি সৎ এবং এই রমজানের মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করছে। একবার ইচ্ছে করছিল রিকশা থেকে নেমে যাই, আবার মনে হলো আমি নেমে গেলেই কি! অন্য কেউ না কেউ তো পুনরায় সওয়ার হবেই। আবার মনে হচ্ছিল—যদি পারতাম, তাকে খানিকক্ষণ বসিয়ে আমি চালাতাম। যদিও কিছুই পারতাম না, তবু একটা অভিজ্ঞতা অন্তত হতো। তবে তা তো আর সম্ভব নয়। আমরা স্বল্প আওয়াজে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে, তার জন্য কী করা

যায়, যাতে সে কথাগুলো শুনতে না পায়। কেননা সে শুনতে পেলে কষ্ট পেতে পারে। ভাবতে পারে নিজের দুর্বলতা হয়তো তাকে ছোট করে দিচ্ছে অন্যদের কাছে। মনটা খুব খুঁতখুঁত করছিল তার জন্য কিছু একটা করার অভিপ্রায়ে।

শেষমেশ গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর তার প্রতি সামান্য একটু সহানুভূতি প্রকাশ করাতেই কী সুন্দর একটা হাসি হাদিয়া দিলো! সত্যিই সে হাসি বড়ই প্রশান্তিদায়ক। তার এতক্ষণের ঘাম ঝরানো সকল ক্লান্তি দূর করে দিতে না পারলেও, কিছুটা হয়তো লাঘব করতে পারলাম। মনের ভেতর শান্তি অনুভব করলাম।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর তারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় অন্য দুস্থদের, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।' [সুরা হাশর, আয়াত: ৯]

রাস্তাঘাটে হাত পেতে সাহায্য চাওয়া নীচ মানসিকতার মানুষগুলোকে দান করার পরিবর্তে উচিত হলো, মুখ ফুটে চাইতে না পারা এই মানুষগুলোর জন্য কিছু করা। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি পেশাকে নিরুৎসাহিত করে পবিত্র হাদিসে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'কষ্ট করে পিঠে বোঝা বহন করে জীবনযাপন করা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে অনেক উত্তম।' (সহিহ বুখারি: ১৪৭১)

অন্য হাদিসে রাসুল আরও বলেছেন, 'নিশ্চয়ই উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।' (সহিহ বুখারি: ১৪২৭)

যদি অসহায় এই মানুষগুলোর জন্য কিছুই করতে না পারেন, তাহলে শুধু মন খুলে খাস দিলে তাদের জন্য দোয়া করুন। দেখবেন, উনাদের হাসিমুখগুলো দেখলে অন্তরটা পরম শান্তিমাখা স্পর্শে শীতল হয়ে যাবে, মন খারাপ এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আমাদের মুসলিমদের ভেতর সেই চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। নিজে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে। বড় শিল্পপতিরাই দরিদ্রদের অর্থ সহায়তা করবে এমন ভাবনা কোনো মুসলিমের ভাবনা নয়। আল্লাহ ছাড়া সকলেই অভাবী, যে যত ধনীই হোক, অভাব সবারই আছে।

মূলত নবিজির ভাষ্যমতে মনের বিত্তই প্রকৃত বিত্ত। অন্যের দুঃখ দূর করার জন্য অনেক বড় বিত্তশালী হওয়া লাগে না, লাগে কেবল দুঃখী-দরিদ্র মানুষের কষ্ট অনুভব করার মতো সুন্দর মন। আল্লাহ আমাদের সবার ভেতর সংবেদনশীলতা দিয়ে দিন। প্রবল করে দিন আমাদের সহানুভূতির শক্তি। আমিন।

শিক্ষার্থী, শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ। মিরপুর ২, ঢাকা।

শৈশবের ঈদ শোক

উবাইদুল্লাহ তারানগরী

শৈশব; অত্যন্ত মধুর, স্মৃতির দর্পণ। সবারই আছে একটি শৈশব। আছে রঙিন মখমল স্মৃতি। কিছু সুখের, কিছু দুঃখের। ব্যস্তজীবনের ক্লান্তিপথে কল্পনার ডানায় ভর করে হলেও সবাই যেতে চায় শৈশবের রঙিন আঙিনায়, সবুজ উদ্যানে। কে না ভালোবাসে শৈশবের স্মৃতিচারণ। সবাই বাসে। তাই তো শৈশব ও স্মৃতি দখল করে আছে সাহিত্যের বড় অঙ্গন। বড়দের স্মৃতিগদ্য দারুণভাবে উপভোগ করে পাঠককুল। আমারো আছে কিছু স্মৃতির ছেঁড়া পাতা।

১. বয়স তখন সাত কি আট। ধোবাউড়া কাশিনাথপুর মাদরাসায় মক্তবে পড়ি। সুযোগ পেলেই রঙিন জামা পরে প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াই পুরো গ্রাম। বাঁশঝাড়ে বাঁশঝাড়ে বক খুঁজে বেড়াই। গর্তে-গুহায় পাখির ছানা অনুসন্ধান করি। সুন্দর বেড়াল দেখলে ধরার ফন্দি করি। ব্যর্থ হয়ে ফড়িংয়ের পিছনে দৌড়াই। ক্ষণে আবার কোকিলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাকে ক্ষেপাই। প্যাঁচার সাক্ষাৎ পেয়েই অঙ্গভঙ্গি দিয়ে কথা বলি। প্যাঁচারে প্যাঁচারে তোর বা ঠ্যাং দেখি; প্যাঁচারে প্যাঁচা, তোর ডান ঠ্যাং দেখি—এগুলো করতাম। প্যাঁচাও কথা মতো দেখাতো। পরক্ষণেই ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ শুনে থেমে যেতাম। আওয়াজের উৎস খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতাম। খেলা শেষে তারা মসজিদের টাইলসের শীতলতা স্পর্শ করতাম। হাউজে ওজু করতে গিয়ে আধা গোসল হয়ে যেত। হাউজের রঙিন মাছগুলো ধরার জন্য কৌশল করতাম। কিন্তু মাছগুলো আমার মতলব বুঝে ফেলত। তাই কাছে ভিড়ত না। কলাগাছের ডগা দিয়ে ঘোড়া বানাতাম। চাঁদনি রাতে ছায়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতাসহ কত বিচিত্র কাজ যে করতাম। একটুও ক্লান্তিবোধ হতো না। যেন ভাবনাহীন এক রাজপুত্র। ঈদের দিনের খেলাধুলার স্মৃতি তো এখন নতুন প্রজন্মের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। খাওয়া পরার চেয়ে এসবেই বেশি মজা পেতাম। ডিভাইসমুখর শিশু-কিশোররা কী এর সিকিভাগ আনন্দও এখন পায়! চাঁদ দেখে ফেসবুকে। আনন্দময় ঈদের দিনেও সারা দিন টিভির পর্দায় আর মোবাইলের স্ক্রিনেই বুঁদ হয়ে থাকে, আনন্দ খোঁজে।

২. এত কিছুর ফাঁকেও আমার পাখিপ্রেম, বকপ্রেম চরমে উঠেছিল। সবুজের দ্বীপ, ঝাড় থেকে ঝাড় চষে বেড়িয়ে সাধনার

প্রাচীর ডিঙিয়ে হাজিবাড়ি থেকে দুটি বকছানা সংগ্রহ করি। শুরু হয় পোষা। আদর করে দানা দিই, খানা দিই, পানি দিই। পোকা-মাকড়, ফড়িং দিই। পুঁটি মাছ দিই। মাছেরা বিরহ করে ধরা না দিলে আম্মুর কাটা মাছ লুকিয়ে এনে দিই। যত্ন অব্যাহতই ছিল। কিন্তু হঠাৎ পড়াশোনার চাপে বকের যত্নে ভাটা পড়ে। সকাল নয়টায় শিক্ষাঙ্গনে যাওয়া বিকেল পাঁচটায় ফেরা। সারাদিন খোঁজ নিতে পারতাম না। উড়াল শেখার কাছাকাছি বয়সে যখন উপনীত হলো।

একদিন মাদরাসা থেকে ফিরে এসে দেখি, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছে বকদুটি। গলা বাড়িয়ে হা করে ক্যাঁচক্যাঁচ করছে। আমার মনটাও কেঁদে ওঠে। তখন থই থই বন্যা। চারদিকে পানি আর পানি। আমি না থাকায় কেউ কোনো খাবার দেয়নি। আম্মু আরও সুযোগ পেয়ে যান; ক্ষিপ্র গতিতে শুরু করেন বকাঝকা। আগেই বলেছিলাম প্রাণীকে কষ্ট দিস না। অভিশাপ দেবে। এই সেই। এখনো জ্বলজ্বলে মনে পড়ে। কিচ্ছু না পেয়ে আম্মু তখন ভাত দিয়েছিলেন। তা-ই খেয়েছিল ক্ষুধায় ছটফট করতে থাকা বকদ্বয়। এই সুযোগে অযত্নের অভিযোগ তুলে আম্মু উত্তরে বাড়ির অসহায় দাদিকে দিয়ে দেন একটি বক। তিনি জবাই করে খেয়ে নেন। আমি শোকে কান্নাও ভুলে যাই। একসময় আম্মুর মুখে বকের অভিশাপের কথা শুনে বিগলিত হয়ে যাই। ফলে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাড়ির পিছনে উরু পানি ভেঙে জঙ্গলের শ্যাওড়া গাছটায় ২য় বকটিকে রেখে আসি। সারারাত গাছে থেকে কিছুটা উড়াল শেখে বকটি। পরের দিন যখন জুয়েলদের পুকুর পাড়ে কলাগাছের ওপর গিয়ে বসে। ওমনি জুয়েল কোটা দিয়ে বাড়ি দিয়ে ফেলে দেয়। এবং ধরে জবাই করে দেয়। তাও আবার ঈদের দিন। পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন। নতুন পোশাকে আতরসাজা আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। দুঃসংবাদটি শুনে আমার কী যে কষ্ট হয়েছিল। বোঝাতে পারব না। মনে হলে এখনো ভেতরটা চিনচিন করে ওঠে।

জয়দেবপুর, গাজীপুর সিটি

‘যে অন্ধকারে আছে তার সামনে আলো ধরো, যে পিপাসায় ছটফট করছে তার সামনে ধরো শীতল জল, যে ক্ষুধার্ত তাকে দাও একটুকরো রুটি।’

রমজানের বইমেলা: আমার টুকরো স্মৃতি

● **ওমর ফারুক**

রমজানের দিনে সকলেই চায় একটু আলস্য সময় পার করতে। কোথাও সফরের আহ্বান এলে মুখ বাঁকিয়ে বলে, দুঃখিত, অন্য কোনো দিন। রোজা রেখে এই রোদ্দুরে কার-ই-বা আকাঙ্ক্ষা জাগবে ঢাকা-শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে! আমারও ভাল্লাগে না, কারণ আমিও নই এই অলস শ্রেণির বাহিরের কেউ।

কিন্তু আমার সোনার সংসারে বাধ সাধল বন্ধুবর মিযান। ফোন করে জানালো, জুমার পর বাইতুল মোকাররমে প্রতিবাদ সভা হবে চলে আসো। আমিও ভাবলাম, বসে থাকতে থাকতে শরীরে জং পড়ে গেছে। একটু উম্মাহর জন্য কষ্ট করে আসি। এসকল গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে উম্মাহর আদৌ কোনো কল্যাণ আছে কি না, সেই প্রশ্নকে ভাবনার ঊর্ধ্বে রেখে বেরিয়ে পড়লাম বায়তুল মোকাররম পানে 'বায়তুল মোকাদ্দাসে'র টানে।

কিন্তু ভাগ্যটা মন্দ ছিল বোধহয়। পোস্তগোলা যাওয়ার আগেই সংবাদ পেলাম, সভা নামাজের পর হচ্ছে না বরং এখনই শুরু। আর বাইতুল মোকাররম নয়, জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে হচ্ছে।

এই বার্তা শুনে, জ্যাম ঠেলে দ্রুত বেগে ছুটছিলাম প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে। কিন্তু বায়তুল মোকাররম পৌঁছে শুনি, প্রেসক্লাব নয় বরং শাহাবাগে। মনে হলো বনি ইসরায়েলের তিহ ময়দানে আছি। কখনো এখানে তো

কখনো ওখানে আবার বায়তুল মোকাররমে। এরই মধ্যে জানতে পারলাম সভা শুরু হয়ে গেছে এবং প্রায় শেষ পর্যায়ে। নিউজটা শুনে খুবই ব্যথিত হলাম। অনেক আফসোসও হলো। কপাল মন্দ হলে যা হয় আরকি।

ভাঙা হৃদয়ে ঢুকলাম বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে। ঢুকে তো আমি অবাক। ইসলামী বইমেলা হচ্ছে এই রমজানজুড়ে আর আমি কিনা জানিই না! নিমিষেই হারিয়ে গেল আমার সব আফসোস আর গ্লানি, বইমেলা পেয়ে খুশিতে আটখানা। যারপরনাই খুশি হলাম। এ তো আমাদের ঐতিহ্য। এদেশের ধর্মভীরু জনতা ও উলামা-তলাবাদের আস্থার কিতাবমেলা। যেখান থেকে মানুষ সংগ্রহ করে তাদের ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ করার পাথেয়, ধর্মীয় কিতাবাদী। যেই মেলা মুক্ত নাস্তিক্যবাদের ভয়াল থাবা থেকে। যা জ্বলন পয়দা করে শাহাবাগী দাদাদের কলবে।

ব্যস, ঘুরতে লাগলাম মনের সুখে। প্রচুর হাঁটলাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম অনেক বই। জুমার নামাজ আদায় করলাম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে। সাথে যোগ হলো বন্ধুবর মিযান। দুজনে মিলে চুটিয়ে ঘুরলাম। আগে জানা না থাকায়, বাসা থেকে তেমন টাকা নিয়ে আসা হয়নি। কিন্তু বইমেলা থেকে বই ছাড়া তো আর যাওয়া চলে না। তাই নগদে টাকা কালেক্ট করে কিছু অমূল্য রতন সংগ্রহ করলাম আমার পাঠশালার জন্য। হাদিয়াও দিলাম বন্ধুকে। বন্ধুর সাথে কথা হলো উম্মাহর সমস্যাগুলো নিয়ে। উম্মাহর জেগে ওঠার পদ্ধতি কী হবে, তা নিয়ে। আরও অনেক...। সবশেষে মনে হলো, আজকের দিনটি বোধহয় সার্থক।

করাণীগঞ্জ, ঢাকা

“নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয়া খুব সহজ। নিজেকে মানুষ বলে প্রমাণ করা খুব কঠিন, আর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে মানুষ পরিচয়ের স্বীকৃতি লাভ করা আরো কঠিন। নিজের স্তর তুমি নিজেই নির্ধারণ করো।”

ক্ষয়িষ্ণু আগরবাতি

রফিকুল ইসলাম রিয়াদ

সকাল আটটা। ধোঁয়া উড়ছে হাওয়ায়। আগরবাতির বিষণ্ণ ধোঁয়া। চারিদিকে শুধু কান্না। জিগরফাটা কান্না। সবার চোখেমুখে বিলাপ আর মাতম। অশ্রুতে ঝরছে হৃদয়ের দুঃখ। ঝরছে ভীষণ কষ্ট। নেত্রাচলে বিষাদের ধারাপাত। কেউ বা আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার চোখে বিন্দু বিন্দু জল। ঠোঁটে কান্নার শব্দ নেই। জানি, কাঁদলে লাশের কষ্ট হয়। দেহ একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত, চেতনাহীন। ওষ্ঠাদ্বয় একদম শুকনো। বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেলছি। কী করতে গিয়ে কী করে ফেলি। এরপর আবার লাশ দেখাতে আমাকে বসালেন।

দেখাচ্ছি লাশ। নানা নেই জেনে অপরিচিত অনেকেই আসছে। সম্ভবত অনেকেই বাল্যকালের সাথি বা সহপাঠী। দেখছে শেষবারের মতো। কারও কারও মুখে নানার চলাফেরার আচরণের কথা। কেউ দেখে দেখে অশ্রুর টলোমলে দৃষ্টি বন্ধ করে চলে যায় খাটিয়ার স্থান থেকে।

সকাল নয়টা। প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুর। সময়ের আবর্তনে তার রূপ বদলায়। কারও দিকে না তাকিয়ে ঠিক আপন নিয়মে চলে যায়। কারও চোখে অশ্রু ঝরায়। কারও ঠোঁটে কান্না ফোটায়। কারও আবার বিরহের করুণ সুর তোলে। চলছে তার নিয়মানুযায়ী। শোনা যাচ্ছে আম্মুর কান্নার আওয়াজ আর খালাদের চিৎকার। বাবা নেই! চলে গেলেন না ফেরার জগতে। ভালোবাসা নিয়ে চোখ ভরে আর দেখতে পারবেন না। এমন কষ্ট সহ্য করা দুরূহ। নানি আনুমানিক প্রায় দশ বছর হলো দুনিয়াতে নেই। মা আর বাবা নেই মানে জগৎভর শূন্যতা অনুভব। আর মেয়ের জন্য তা যেন আকাশসম তীব্র কষ্ট। বাপের বাড়ি আর আষাঢ়ে বা ফলের মৌসুমে বেড়ানো হবে না। যদি ভাইয়েরা ভালো হৃদয়ের হয়, তাহলে বেড়াতে যাওয়া হয়। না হয় হাজার কষ্ট গুমরে চেপে দিন কাটিয়ে দেয়।

সকাল দশটা। জানাযার নামাজের সময় নিকটবর্তী। আগত সবাই জানাযার অপেক্ষায়। শেষ বারের মতো নানার লাশ দেখানো হচ্ছে সবাইকে। চার পায়ের পালকি কাঁধে তোলা হলো। মাঠে নেওয়া

হচ্ছে জীবনের শেষ বিদায়ের নামাজ পড়ার জন্য। আমিও ধরলাম একপাশে। ধীরে ধীরে পা যেন স্থির হয়ে যাচ্ছে। পা যেন আগাচ্ছে না। চোখ ভিজে যাচ্ছে অশ্রুতে। ভেতর থেকে ক্রমশ বাড়ছে ফোঁপানো। এত জল কোথা থেকে এলো। বাঁধভাঙা বিষণ্ন জল।

একসময় পৌঁছালাম মাঠে। জানাযার নামাজের পুর্বক্ষণ। কিছু বয়ান হলো সবার উদ্দেশ্যে।

"আজকের লাশই নসিহত করছে যে, আমিও তোমাদের মতো চলাফেরার সাথি ছিলাম। সন্তানসন্ততি সবকিছু আছে। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছি আখেরাতের জগতে। আর জেনে রেখো, তোমরাও এই অন্ধকার কবরে আসতে হবে।"

বেলা এগারোটা। কবরে সমাহিত লাশ। সমাধিতে সবার দুঃখভরা দেহের হস্ত দিয়ে টুকরো টুকরো মাটি ফেলছে। আসলে একজন অন্তরঙ্গ মানুষকে এই যে মাটিচাপা দিয়ে সবে চলে আসে। আমৃত্যু না দেখা বিদায় দেয়। তাঁর প্রতি কি একটু মায়া জন্মে না। একটুখানি দয়া লাগে না। মায়া আর ভালোবাসা অবশ্যই জন্মে। এই ভালোবাসা আর মায়া রেখেও দুনিয়ার মানুষ বিদায় দেবেই। আর এটাই দুনিয়ার রীতি ও নীতি। আমি আপনি মরে গেলে এমনই হবে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা এভাবে বিদায় দেবে। একসময় ভুলে যাবে আমাকে আপনাকে। সাথে কেউ যাবে না, থাকবেও না; থাকবে কেবল তোমার আমার নেক আমল। তাই নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া চাই।

হাশরের দিন একদল মানুষ আফসোসের কণ্ঠে বলবে "সে বলবে, হায়! এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু পূর্বে প্রেরণ করতাম। (সুরা ফজর, আয়াতঃ ২৪) অর্থাৎ, নেক আমল করে আসতে পারতাম, কতইনা ভালো হতো আজ এমন বিপদে পড়তাম না। অতএব আমরা যেন মরার আগে মৃত্যুর জন্য তৈরি হই। আখেরাতের সামান জোগাড় করি।

পরিশেষে দোয়া করি, আদম আ. থেকে শেষ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নরনারী কবর দেশে চলে গেছেন, আল্লাহ যেন সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন। আমিন।

শ্রীপুর, জামালগঞ্জ

'আজকের তরুণ, সেই তো আগামী জীবনে জীবনের কর্ণধার! আজকের তরুণকে পথের আলো দেখাও, আগামী দিনে জাতি আলোর পথ পেয়ে যাবে'।

শৈশবের ঈদ

● **আলী ওসমান শেফায়েত**

মুসলিম উম্মাহর কাছে প্রতিবছর পবিত্র মাহে রমজান যেমন বয়ে আনে রহমত, মাগফেরাত, আর নাজাত; তেমনই এই রমজান মাসের শেষে বিশাল আকাশের পশ্চিম প্রান্তে উঁকি দেয় একফালি রূপালি চাঁদ। সেই উঁকি দেওয়া চাঁদ দেখেই সকল মুসলমানের মধ্যে খুশির বার্তা নিয়ে হাজির হয় ঈদ। চাঁদ দেখার সাথে সাথে গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে নানাধরনের গ্রাম্যছড়া কাটতে কাটতে যেন পুরো গ্রাম মাতিয়ে তুলতাম আমরা।

যে ঈদে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ সকলেই আর কিছু না হলেও নতুন পোশাক পরে ঈদগাহে গিয়ে একসাথে ঈদের নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে ঈদের মাঠে একে অপরের সাথে হাসিমুখে কোলাকুলি, আনন্দ ভাগাভাগি করে থাকে। সে কী এক আনন্দঘন মুহূর্ত, তা কি নগরায়নের যুগে শহুরে জনগণ কখনো বুঝতে পারবে?

ঈদগাহের পাশেই বসে ছোটখাটো প্রাণবন্ত মেলা, যেখানে ছোট ছোট শিশুদের পাশাপাশি বড়দেরও দেখা যায় গজা, চনাবুট, জিলাপিসহ হরেকরকমের জিনিসপত্র কেনাকাটাতে ব্যস্ত। অনেকেই বেলুন, বাঁশি, চানাচুরের দোকান নিয়ে বসে। শিশুরা বাঁশি, বেলুন, মেয়েরা হাতে নতুন চুড়ি পরে পুরো ঈদগাহে চষে বেড়ায়। গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে রান্নার ধুম পড়ে যায়; হরেকরকমের সেমাই, মিষ্টি তৈরিতে। বিভিন্ন স্বাদের সেমাই খেয়ে স্থানীয় বাজারের চায়ের দোকানগুলোতে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মিলিত হয়ে আলাপচারিতার পাশাপাশি চায়ের কাপে চুমুক, আহা সে কী আনন্দ!

ঈদের নামাজ শেষ করে মুরুব্বিদের কবর জিয়ারাত করতাম সকলে মিলে। এরপর দলবেঁধে মা-বাবাকে সালাম করেই ঈদের সালামি নিয়ে এই ঘরে ওই ঘরে জ্যাঠা-জ্যাঠি, চাচা-চাচি, ভাই-ভাবিসহ আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে বাড়িতে সালাম করে তাদের কাছ থেকেও ঈদের বকশিশ বা ঈদ-সালামি নিতাম।

সেই সালামি পেয়ে বন্ধুরা মিলে বেড়াতে যেতাম কুতুবদিয়া সমুদ্র সৈকতে। ঘুরে ঘুরে দেখতাম বাংলাদেশের প্রথম বাতিঘর 'কুতুবদিয়া বাতিঘর' ও 'কুতুবদিয়া বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প'র মতো বাংলাদেশের বৃহত্তম বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের পাড়ে বসে সমুদ্রের ঢেউয়ের খেলা দেখতাম। সারি সারি ঝাউবীথির মাঝখানে বসে নানারকম

আলাপচারিতার কথা কি কখনো ভোলা যায়। আজ সবই আছে ঠিক সেই আগের মতোই। নেই সেই আনন্দ, নেই সেই সময়টুকু।

আজ আর নেই সেই দিনগুলো, নেই সেই বন্ধু, নেই সেই সমাজ, নেই সেই পরিবেশ। আজ ঈদ কাটে অনেকটা চার দেয়ালের মাঝে বন্দির মতো। যে যার মতো করেই কাটায় ঈদ। বড় লোকের ঈদ হয় দেশ-বিদেশ আর গাড়িভ্রমণে আর গরিবের ঈদ গ্রামের লোকালয়ে নিজেদের মতো করেই। সেসব দিনের কথা মনে হলে আজ দুচোখ বেয়ে পানি ঝরে।

হাজারো স্মৃতিময় মুহূর্তগুলো ফ্রেমবন্দী মনের মাঝে, ঈদ আনন্দ যেমন আছে, তেমনই রয়েছে বেদনা। হেসে খেলেই বড় হয়েছি, বাবার হাত ধরেই গিয়েছি ঈদগাহে। বাবা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ডাকতেন কইরে বাপ দ্রুত আয় ঈদের মাঠে যাব, নতুন পোশাক পরে বাবার হাত ধরে, মায়ের মমতা নিয়ে গিয়েছি ঈদের মাঠে।

আজ অনেকটা বড় হয়েছি কিন্তু কেউ বলেনা চলো ঈদগাহে যাই। নেই সেই কান্নাকাটি নতুন পোশাকের জন্য। সন্তানের নতুন পোশাকের জন্য বাবার সাথে মায়ের ঝগড়া আজকাল নেই বললে চলে। আজ নতুন পোশাক না নিলেও ঈদগাহে যাই, নামাজ পড়ে বাড়ি চলে আসি। ঘুরাঘুরি সে-তো হারিয়ে গেছে জীবন থেকে।

নবীনকণ্ঠ'র ঈদস্মৃতি নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার হাত যেন ফসকে যাচ্ছে পুরোনো সেই স্মৃতির কল্পনাতে। চোখজোড়া যেন লোনাজল বিয়োগে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সবকিছু যেন আমাকে কানে কানে বলে দিচ্ছে শৈশবকালের ঈদস্মৃতি আর যৌবনকালের ঈদস্মৃতির মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। এই হলো আমার স্মৃতিময় ঈদ।

শিক্ষক ও গবেষক

ইমেইল: aliosmansefaet@gmail.com

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান

ঈদ ভ্রমণে চোখের জল

আশিকুল্লাহ মাহমুদ

নিলয় খুব ভ্রমণপ্রেমী। ঘোরাঘুরি করতে ভীষণ ভালোবাসে। তার আব্বুও ভ্রমণ করতে খুব ভালোবাসেন। ঈদের দিন তারা সুন্দরবন ঘুরতে যাবে বলে ইচ্ছে করল, এবং দশ-বারো জনের একটা গ্রুপ ঠিক করল। তার বাবা-ই হলো এই গ্রুপের প্রধান। দিনভর সবকিছু প্রস্তুত করল। সন্ধ্যায় গাড়িতে চড়বে। সকাল হবে সুন্দরবনে। যেই কথা সেই কাজ, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। রক্তিম আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। হালকা মিটিমিটি তারা পূর্ব আকাশে উঁকি দিচ্ছে। এমন সময় তারা গাড়িতে উঠে পড়ল। সারারাত আড্ডা আর হালকা তন্দ্রায় দোল খেতে খেতে সকাল হয়ে গেল। গাড়িও এসে থামল। সবার মুখেই ঘুমের ছাপ। এর মধ্যেই সবার মুখে এক আনন্দের রেখা দেখা যাচ্ছে। যেন মনে হচ্ছে একেকটি ফুটন্ত গোলাপ। রাতের নিকষ আঁধার পেরিয়ে পূব আকাশে উঁকি দিচ্ছে ভোরের সূর্য। সূর্যের আলোকরশ্মি চারদিকের সবুজ বৃক্ষরাজির শিশিরভেজা পাতাগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলছে।

এমন সময় সবাই জাহাজে উঠে গেল। ঘুরেঘুরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করবে। জাহাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। মাঝামাঝি চলে এসেছে। সবাই খুশিতে, আনন্দে আত্মহারা। আচমকা তাদের মধ্য থেকে দুইজন জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে গেল। ভয়ে সবাই চ্যাঁচামেচি শুরু করল। তাদেরকে উঠানোর সরঞ্জাম রেডি করতে করতে দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে তারা হাবুডুবু খেতে খেতে পেট পানিতে টইটম্বুর। অতঃপর জাহাজের কর্মীদের সাহায্যে কোনো মতে উঠানো হলো। সবাই তাদের নিয়েই ব্যস্ত। এটা-ওটা জিজ্ঞেস করছে, কীভাবে কী হলো-না হলো। এদিকে নিলয়ের বাবা খুব পেরেশানিতে ছিলেন। কারণ তিনিই তো এই কাফেলার প্রধান। সুস্থ অবস্থায় তাদেরকে উঠাতে দেখে নিলয়ের বাবা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। একটু স্বস্তি বোধ করছেন।

কিছুক্ষণ পর নিলয় ভেজা শরীর নিয়ে হাজির হলো। তার আব্বু-আম্মু দেখামাত্রই হকচকিয়ে উঠলেন। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, কিরে বাবা, তোর শরীর

ভেজা কেন? মুচকি হেসে বলল, আমিও পড়ে গিয়েছিলাম! বলা শেষ হওয়ার আগেই আব্বু-আম্মু জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। তাদের কান্না দেখে নিলয়ও স্থির থাকতে পারেনি।

অতঃপর নিলয় একাকী তার অবস্থাটা চিন্তা করতে লাগল, সে যখন পড়ে গিয়েছিল, তার শরীরে ছিল শীতের মোটা কাপড়, পায়ে কেস জুতা। এগুলো ভিজে যেন শিশার মতো ভার হয়ে গেছে। এমনিতেই ভয়ে কাতর আর এগুলোর ভারে আরও বেহাল অবস্থা। কোনোরকমে মাথাটা উঁচু করে দেখে সাদা সাদা কী যেন ভেসে আসছে। এটা দেখে ভয়ে একেবারেই শেষ। শেষবারের মতো জীবন বাঁচানোর চেষ্টায় আবারও দুইহাত কোনোরকম পানিতে মেরে একটু মাথাটা উপরে উঠিয়ে হালকা নিঃশ্বাস ছাড়ল। পাশেই দেখে জাহাজের কর্মচারীরা টিউব এবং কিছু ককশিট পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে। এগুলো দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পেল। হয়তো আবারও জীবনটা ফিরে পাবে। তবে একটা জিনিস এখনো ভয় করছে যে, না যেন নিচ থেকে কোনো মাছ বা কোনো প্রাণী এক লোকমায় পেটে নিয়ে নেয়।

আবার যদি জাহাজের পাখা টুকরো টুকরো করে ফেলে, তাহলে তো মাছের জন্য আরও সহজ। পিস পিস করে শুধু গিলে ফেলবে। এতক্ষণে টিউবটা হাতের নাগালে এসে পৌঁছেছে। টিউবটা ধরে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিলো। এরপর জাহাজের কর্মীরা কোনোরকম টেনে উপরে উঠালো। একটু স্বস্তি বোধ করল। আল্লাহর কাছে মনে মনে বেশ দোয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। আব্বু-আম্মুর কান্না থামল। চোখজোড়া কাপড়ের আঁচল দিয়ে হলকা মুছে নিলো। বলল, বাবা তুই কেমনে পারলি আমরা টেরও পেলাম না! এরপর উঠানোর বিষয়টাও বিস্তারিত বলল। এরপর নিলয়ের কাঁপুনি দেখে তার আম্মু জাহাজের কেবিনে নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। একঘুম হয়ে গেল। উঠে দেখল তারা সুন্দরবন ঘোরার প্রায় শেষ দিকে। জানালায় উঁকি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ প্রকৃতিক দৃশ্য দেখল। দেখতে দেখতে হঠাৎই মনে পড়ে যায় সেই ভয়াবহ অবস্থা। চোখের কোনে জল এসে জমা হয়। বেয়ে পড়ার আগেই আবার শুকিয়ে যায়। প্রাকৃতিক সুন্দর দৃশ্য সেই ব্যথাকে ভুলিয়ে দেয়। এভাবেই সময় কেটে যায় জাহাজের কেবিনে। হয়তো ঘণ্টাখানেকও লাগবে না জাহাজ ঘাটে এসে পৌঁছাবে। সুন্দরবনের পুরোপুরি আনন্দ উপভোগ করা হলো না। অতঃপর সবাইকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

২২ নং ওয়ার্ড, ময়মনসিংহ মহানগর

একমুঠো লালন শাহ

দ্বিপ্রহর

ট্রেনের সিটে বসে আছি। জানালা দিয়ে দেখছি গ্রামীণ দৃশ্য। মাঠের পর মাঠ পরিপক্ব ধূসর গম। কোথাও তামাকের সবুজ মাঠের মাঝে ফুটে আছে গোলাপি আভার তামাকফুল। আবার কোথাও কোথাও নজরে পড়ছে সূর্যমুখী ও ভুট্টা খেত। সামনের সিটে একটা পিচ্চি ছেলে সেই কখন থেকে খেলনা পাখি নেড়ে পুকপুক বাজাচ্ছে। পাখির পুকপুক আওয়াজে মাথা ঝিনঝিন করছে আমার। সিট থেকে উঠে বগির মাথার দিকে গেলাম। দরজার সামনে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাইয়ের দৃশ্য দেখে বেশ ভালো লাগছে।

দুই বগির মাঝে লাল কাপড় বিছিয়ে বসে আছে চল্লিশোর্ধ্ব এক ভদ্রলোক। মুখভর্তি সাদা-কালো দাড়ি। মাথায় লাল কাপড় প্যাঁচানো। গায়ে লাল ফতুয়া ও লাল লুঙ্গি। কোলের মধ্যে একটি লাল রঙের ঝোলা। বাম হাতে ধরে আছে একটা কাঠের লাঠি। লোকটাকে দেখে মনে হলো লালনভক্ত। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন?

-আমি তো ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

-আলহামদুলিল্লাহ। কোথায় যাচ্ছেন?

-আমি পথচারী।

-কোথা থেকে উঠেছেন?

-আমি পথিক।

-এসবের মানে কী?

-এসব এখন বুঝবেন না। যখন চুলদাড়ি পাকবে, তখন ঠিকই বুঝে আসবে।

লালন শাহের লোকেরা সাধারণত নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে। কারণ লালন শাহ ছিল অজ্ঞাত পরিচয়ের মানুষ। কথিত আছে, লালন শাহ একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকেরা তাকে মৃত ভেবে কলাগাছের ভেলায় করে ভাসিয়ে দেয় নদীতে। ভেলাটা লালনকে নিয়ে ভেসে ভেসে একটা গ্রামে এসে পৌঁছায়। সেখানের লোকজন তাকে নদী থেকে উঠিয়ে সুস্থ করে তোলে। এক মহিলা তাকে আশ্রয় দেয়। সেই মহিলার বাড়িতে লালন থাকতে শুরু করে। তাই, লালনভক্তির কারণে তার লোকেরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে অজ্ঞাত হিসাবে পরিচয় দেয়।

তাকে বললাম, আমরা কয়েকজন লালন শাহের মাজারে যাচ্ছি।

সে বলল, সেখানে গিয়ে কী করবেন? সেখানে মন্দির নেই, মসজিদ নেই, গির্জা নেই। লালন শাহ তো ভিক্ষা করে বেড়াতো। তার একটা ভিক্ষার থলে ছিল। সে ভিক্ষা করে মায়ের সেবা করতো।

আমি প্রসঙ্গ বদলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঈশ্বরদী স্টেশন কতদূর?

-এখন কোথায় আছি?

-ভেড়ামারা।
- ঈশ্বরদী সামনের স্টেশন।
-আচ্ছা, আপনি থাকেন। আমি গেলাম।

লালন শাহের মাজারের সীমানায় প্রবেশ করলাম। বিভিন্ন ধাতুর আংটি ও নানারকম মালা নিয়ে সামনের দিকে বসে আছে কয়েকজন হিজড়া। এসব বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। যেখানে সেখানে বসে আছে নানান বয়সী পুরুষ-মহিলা। রাস্তার দুধারে সবুজ গাছ। রাস্তার মাঝ দিয়েও রয়েছে গাছের সারি। মাজারের আগে একটা নারকেল গাছের সাথে ঠেস দিয়ে আছে এক লোক। গায়ে সাদা কাপড় জড়ানো। এমনভাবে ঝিমাচ্ছে যেন শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই। ডানপাশে এক মহিলা বসে আছে ভিন্ন একটা নারকেল গাছের নিচে। সে একতারা বাজিয়ে গান গাচ্ছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গানের শব্দগুলো বোঝার চেষ্টা করলাম। শব্দগুলো আধো আধো বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কোনো অর্থ বোঝা যাচ্ছে না।

সামনে হেঁটে গেলাম। একটা চমৎকার ঘরের ভেতর লালনের মাজার। ঘরের উপরে রয়েছে বিশাল সাদা গম্বুজ। ঘরটির বাইরে রয়েছে আরও একটি এরিয়া। সেখানে মলম শাহ, জাগো শাহ, গোলাম শাহ ছাড়াও আরও অনেক লালনভক্তের কবর রয়েছে। লালনের পাশে ঘরের মধ্যেই রয়েছে তার পালক মাতার কবর। পাশে রয়েছে বিশাল একটা অডিটোরিয়াম। তার সামনে লালনের ভাস্কর্য। অডিটোরিয়ামে অবস্থান করছে অনেক লালনভক্ত। ডান দিকে একটু ভেতরে আসন গেড়ে বসে আছে সাদা কাপড় পরিহিত এক বৃদ্ধ। তার পায়ের উপরে সেজদায় পড়ে আছে একটা মেয়ে। মেয়েটা সম্পুর্ণ সাদা কাপড়ে ঢাকা। বৃদ্ধ তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। তাকে ঘিরে বসে আছে একদল পুরুষ। দীর্ঘক্ষণ পর সেজদা থেকে উঠে সবাইকে ভাত বেড়ে দিলো মেয়েটা। বয়স আঠারো থেকে বিশ হবে তার।

পাশে রয়েছে একটা মিউজিয়াম। সেখানে কিছু লালনভক্তের চিত্র আঁকা রয়েছে। লালনের ব্যবহারিত পাদুকা, লাঠি ইত্যাদি রয়েছে। লালনের একটা মূর্তিও আছে সেখানে। শুরুর দিকে আছে একটা সংরক্ষিত কাঠের দরজা। দরজার উপরে কলমের দাগাদাগি। তামান্না+নাহিদ, তিতাস+পরি, আদনান+মিম আরও অনেক নামের ছড়াছড়ি দরজা জুড়ে। এখানে প্রেমিক প্রেমিকার নাম লিখে দিতে পারলে তাদের মিলন নিশ্চিত-এই ধারণা থেকে এসব লিখে রেখেছে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে কয়েকজন লালনভক্তের সাথে কথা বললাম। বিকাল পাঁচটায় আমাদের ফিরতি ট্রেন ছিলো। এখন বাজে প্রায় ছয়টা। দেরি করে ফেলেছি বেশ। আজ আর খুলনাগামী কোনো ট্রেন নেই কুষ্টিয়া থেকে। বাস বা সিএনজি করে ফিরতে হবে।

শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর।

ফুলের বার্তা

আমার বাসার বেলকনিটা ফুল গাছে ভরপুর। যাকে একটি ছোটখাটো ফুলবাগানও বলা যেতে পারে। বাগানের গোলাপ গাছটিতে কিছুদিন আগে দেখেছিলাম কয়েকটি কলি ছিল। আজ ভোরে উঠে দেখি কলিগুলো পুরো ফুল হয়ে ফুটেছে।

এই যে প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ। তার জীবনের আয়ু সামান্য দুদিনের। কিন্তু ছোট্ট কলি থেকে তার পূর্ণ ফুল হয়ে ফুটতে অনেক সময়ের অপেক্ষা করতে হয়েছে। গাছ থেকে একটু একটু রস সঞ্চয় করে।

আজ সে আমার বাগানের সৌন্দর্য ও সৌরভ। এবং উদ্যানের গর্ব ও গৌরব। আমার ভালোবাসার পাত্র। অথচ আমার কাছ থেকে তার কোনো দাবি নেই এবং কারও কাছে তার কোনো চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নেই। তবে হয়তো নীরবে সে আমার কাছে একটি মিনতি করে, তার সৌন্দর্যের ভাষায় এবং সুবাসের ইশারায় বলে যায়—শোনো, কত সামান্য আমার জীবনের আয়ু। তবুও সবাইকে ভালোবেসে, চারিদিকে সুবাস ছড়িয়ে আমি লাভ করেছি অমর জীবন।

হে মানুষ, তুমি তো আল্লাহর সৃষ্টির সেরা। তুমিও চারিদিক জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করো। গুণের সুবাসে জগৎকে সুবাসিত করো। তাহলে তুমিও লাভ করবে অমর জীবন।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
শিক্ষার্থী, জামেয়া দারুল মা'আরিফ, চট্টগ্রাম।

স্মৃতির বাগানবিলাস

রাত ক্রমশ বাড়ছে। বেসুরো ডাহুক ডেকে যাচ্ছে অবিরাম। নিশাচর নির্ঘুম রাত্রির কোলে জেগে আছে। ইবাদতমগ্ন বৃদ্ধের মতো আমি ভাবনার জনপদে বসে আছি। ভাবছি, মানুষের কত রকম স্মৃতি থাকে—বেদনার, উচ্ছ্বাসের; বর্ণহীন, বর্ণিল। আমি তাই স্মৃতির ডালা নিয়ে বসি। দেখি, তলানিতে মিশে আছে স্মৃতির বাগানবিলাস; দূর অতীতের অবিস্মরণীয় স্মৃতি। কোনো এক উৎসবমুখর সন্ধ্যায় আমরা দলবেঁধে খোলা প্রান্তরে যেতাম, চাঁদ দেখতে। 'চাঁদ উঠছে, চাঁদ উঠছে' কলরবে মুখরিত হতো সমস্ত পাড়া-মহল্লা। মনমন্দির ছুঁয়ে যেত ঈদের আমেজ। আতশবাজির প্রতিযোগিতা চলত। গভীর রাত পর্যন্ত বড় আপুর চারদিকে গোল হয়ে বসে থাকতাম—মেহেদি রাঙা হাতের আশায়।

ঈদের দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যেত। ঈদগাহে চলে যেতাম। তখনো মেলা জমত না। দোকানিরা মালামাল গুছিয়ে রাখা শুরু করত কেবল। ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখতাম। মনে মনে ঠিক করতাম—এটা-ওটা কিনব।

বাড়ি ফিরে দাদাজানের সাথে গোসলে যেতাম। ঈদের নামাজের জন্য লম্বা গোসল দিতাম। গোসল সেরে দাদা-নাতি নতুন সাজে সজ্জিত হতাম। তিনি আতর মাখিয়ে দিতেন। তাঁর তর্জনী মুঠে পুরে ঈদগাহে চলতাম। তাঁর ভাঙা ভাঙা জবানে থাকত তাকবির—আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু...।

নামাজান্তে দাদাজান পছন্দের জিনিসগুলো কিনে দিতেন। মন ভরত না। বাড়িতে এসে আম্মার কাছে বায়না ধরতাম। আম্মা আগে থেকেই পঞ্চাশ টাকার দুটো নোট আঁচল কোণে গিঁট দিয়ে রাখতেন। তা দিয়ে আরও খেলনা কিনতাম। পুরো দিন চলে যেত ঈদ ও খেলনার আনন্দ-উল্লাসে।

দিন বদলে কুড়িটি বসন্ত পার হলো। চাঁদরাতের সেই 'চাঁদ উঠছে' কলরব এখন হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া কর্পূর। আতশবাজির আড্ডায় যাওয়া হয় না বহুদিন। মেহেদি রাঙা হাতের প্রতি জগতের অনীহা জন্মেছে। দাদাজানের কবরে বিস্তৃত হয়েছে খেজুরগাছের ছায়া। আম্মার আঁচল কোণে পঞ্চাশের বদলে পাঁচশ টাকার নোট পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব বর্ণিল দিনগুলো এখন শুধুই বর্ণহীন স্মৃতি। শুধুই অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

ভাবি, এবার ঈদ আনন্দ একটু অন্যরকম হলে মন্দ কীসে! চাঁদরাতের সেই 'চাঁদ উঠছে' কলরব আর আতশবাজির আড্ডা না পেলেও আমি পেয়ে যাই ইতিকাফকারীর দীর্ঘ মোনাজাত। ক্ষমার আশায় যার ভিজে যাচ্ছে শুভ্র-সাদা দাড়ি। আমি শামিল হবো তাঁর দীর্ঘ মোনাজাতে।

দাদাজানকে না পেলেও আমি পেয়ে যাই খেজুরগাছের ছায়া ঢাকা কবর। ছুটি শেষে ক্ষমার আশায় যে কবরবাসী রচনা করে 'নৈশব্দের রোদন গীতি'। আমি তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রভুর কাছে মিনতি করব অনন্তকালের ক্ষমা। আম্মার আঁচল কোণের টাকাটা নিয়ে কোনো ধুলোমলিন পথশিশুকে দিয়ে বলব—চলো, ঈদের খুশি ভাগাভাগি করে নেওয়া যাক।

বাইজিদ আফনান

শিক্ষার্থী, জামিয়াতুস সুন্নাহ, শিবচর, মাদারীপুর।

ঝুম বৃষ্টিতে ঈদের আমেজ

আজ ঈদের দ্বিতীয় দিন। ঈদ আনন্দে সকলে মাতোয়ারা। সর্বত্রে খুশির আমেজ বিরাজমান। ঈদ আনন্দে খুশির ভাগ বসাতে বাদ যায়নি আসমানও। তাইতো তার গায়ে খণ্ড খণ্ড মেঘ জমা হয়েছে। মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে তেজোদীপ্ত সূর্যটা। মেঘের গুড়গুড় গর্জনে যেন সে নিজেও আতশবাজি ফোটাচ্ছে। ঝড় হাওয়া বইছে। অন্ধকারে ছেয়ে গেছে পুরো আশপাশ। আমি আর ইহসান বিস্তৃত সবুজ প্রান্তরে ফুল স্পিডে সাইকেল চালাচ্ছি। শিরশির বাতাসে শীতল হয়ে গেছে মুখবায়ব। গন্তব্য রহিম মামার চায়ের দোকান। বাতাস তীব্র হওয়াতে চেহারায় ধুলোবালি জমে গেছে। হঠাৎ আসমানি বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অমনি পৃথিবীবুকে নেমে এসেছে মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির পানিতে ঈদের জামা ভিজে শরীরের সাথে লেপ্টে গেল। অদূরে রহিম মামার দোকানের ল্যাম্প লাইট জ্বলছে। ভেজা শরীর নিয়েই সেখানে উপস্থিত হলাম।

—মামা, আসসালামু আলাইকুম।

—ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, কী খেদমত করতে পারি?

—আপাতত দুইটা চা হলেই হয়।

—ঠিক আছে, বসেন।

আকাশ ভেঙে আসা বৃষ্টির পানিগুলো টিনের চালে আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির ঝুমাঝুম মিষ্টি সুর, কালো মেঘের ঝাঁপি থেকে আসা গুড়গুড় গর্জন আর কিছুক্ষণ পরপর বিদ্যুৎ চমকানো পরিবেশটাকে আরও মায়াবী করে তুলল।

একটু পরেই চলে আসে রহিম মামার দোকানের বিখ্যাত চা। চায়ে চুমুক দিতেই হৃদয়াকাশে সৃষ্টি হলো ভিন্ন এক অনুভূতি। বৃষ্টি ভেজা মনটা আরও চাঙা হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টিও থেমে গেল।

গোধূলিলগ্ন; মেঘের কালো ঝাঁপির মধ্য হতে রক্তিম সূর্যটা আবারও উঁকি মারলো। সবুজ-শ্যামল গাছপালা তরুলতা যেন তাদের পূর্ণ সজীবতা ফিরে পেল। এ যেন দুনিয়ার বুকে অনন্য এক নৈসর্গিক উদ্যান, যা স্মৃতির ক্যানভাসে অনন্তকাল স্বপ্নপুরি রাজ্যের গল্প হয়ে থাকবে।

জুবায়ের বিন মামুন
রাখালিয়া, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

অশ্রু ভেজা রজনী

গভীর রজনি। নিস্তব্ধ গোটা পৃথিবী। অন্ধকারের চাদরে ঢেকে আছে ধরণি। রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকা রজনিকান্ত ও তারকারাজির আলো ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

সবাই গভীর ঘুমে বিভোর। দিনের ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়েছে বিছানার পিঠে। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসা নাক ডাকার আওয়াজে শান্ত রাতের সুনসান নীরবতা খানখান হয়ে যাচ্ছে। অদূরে জ্বলতে থাকা ডিম লাইটের আলো আর জালনার ফাক গোলে আসতে থাকা চাঁদের নিভুনিভু আলো মুখে সুড়সুড়ি কাটছে। গায়েব থেকে মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে আমার ঘুমন্ত কর্ণকুহরে। কেউ যেন আমাকে সম্ভাষণ করে বলছে– ওঠো হে বান্দা, উঠে পড়ো। প্রতিদিনই তো ঘুমাবে রাতভর। আজকে না হয় সামান্য সময় আরামের বিছানা ত্যাগ করে লুটিয়ে পড়ো পভুর দরবারে। নিজের গুনাহের কারণে ক্ষমা চাও দয়াময় প্রভুর নিকটে।

সম্ভাষণীয় শব্দ কানে বেজে উঠে শান্তির এক পশলা ঘুম উবে গেল মুহূর্তের মধ্যে। আলিশ্য আছড়ে পড়তে চাইলো আমার শরীরে। শয়তানের আলিশ্যজাল ছিন্ন করে উঠে বসলাম। পাক-পবিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম তাহাজ্জুদের জায়নামাজে। এই নামাজ ছিলো অন্যদিনের তুলনায় একটু ভিন্ন। নিত্যনতুন স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম পুরোটা সময়জুড়ে। জাহান্নামের আয়াত তেলাওয়াত করছি আর অশ্রুসিক্ত হচ্ছে দু-নয়ন। স্মরণ হচ্ছে অতীতে করা গুনাহের কথা। জাহান্নামের ভয়ে কেঁপে উঠছে অন্তরাত্মা।

নামাজ শেষ করে দরুদ ইস্তেগফার পড়লাম। দুহাত তুলে ধরলাম আকাশ পানে, দয়াময় প্রভুর দরবারে। নিজের গুনাহ স্মরণ করে মোনাজাতে অশ্রু ঝরালাম।

গভীর রাতে প্রভুর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ার স্বাদ সত্যিই ভিন্ন রকম। হৃদয় আশ্চর্য রকম কোমল হলো।

নিজের ঘরে এমন নামাজ ও দোয়ার কিসমত খুব কমই হয়। আত্মীয়-স্বজনদের থেকে বিছিন্ন তালিবুল ইলমের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা আসলেই অন্যরকম। হোক না আমার মতো গুনাহগার তালিবুল ইলম।

তোমার রহমত ও করুণা আমাদের ওপর সর্বদা বর্ষণ কর হে প্রভু, আমাদের প্রত্যেক নামাজে আশ্চর্য রকম স্বাদ অনুভব করাও হে দয়াময়!

মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ
তালিবুল ইলম, জামিয়া ওমর বিন খাত্তাব রা.
মোহাম্মদ নগর, গল্লামারি, খুলনা।

আজকের বারিধারায়

দুপুর থেকেই বাইরে কয়লা পোড়া রোদ। রোদের তেজ ও তাপে ঘরের ভেতরটাও উনুনের মতো গরম হয়ে আছে। মাথার ওপরে অবিরাম, অবিশ্রান্তভাবে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের পাখাগুলোও যেন বিদ্রোহ করে বসেছে। ফলে শীতলতার পরিবর্তে ছড়াচ্ছে অগ্নিশিখা। গায়ে হাওয়া লাগছে নাকি আগ্নেয়গিরির তাপ লাগছে বোঝা মুশকিল।
এই গরমের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নামল কোমল বারিধারা। মুশুলধারে শুরু হলো রহমতের বারিবর্ষণ। রহমতের বারিধারায় সিক্ত হলো তপ্ত জমিনের বুক। এখনো আগের মতোই বারিধারা রয়েছে অব্যাহত।

আশেপাশে কেউ নেই। তাই আজকের বারিধারায় কলম হাতে নিয়েছি লিখব বলে, কালির অবগাহনে মনের আবেগটুকু সিক্ত করব বলে। তা কি আদৌ সম্ভব? মরচে ধরা কলমে কি লেখা আসবে? আসবে না। তাহলে কেন অনর্থক কালি নষ্ট করা? অযথাই কলম হাতে নেওয়া? জানি না। আবার কলম হাতে না নিয়েও পারি না। বুকের ভেতরে জমে থাকা বেদনাগুলো জমিয়ে রাখা সম্ভব না। কিছু স্মৃতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। চোখ মেললে দেখা যায়। কিছু বেদনা ভীষণ গোপন। কাউকে দেখানো যায় না, কেউ হয়তো দেখেও না। কিন্তু সেটা বেদনা; আহত করে, ক্ষতবিক্ষত করে আমার অন্তর্গত সত্তাকে। তবুও আমি হাসি। মুগ্ধ হই, আশ্চর্য হই রবের অনুপম সৃষ্টি দেখে।

মনে পড়ছে সেইদিনগুলোর কথা, যখন কানা মাছি, পলানটুক, জুতা-চোর, বৌ-ছি, বরফ-পানি ইত্যাদি খেলায় মেতে থাকতাম। সারাদিন সাইকেল চালিয়ে ঘর্মাক্ত অবস্থায় আম্মুর বকা শুনতাম। নৌকাবাইচ ও ঘোড়দৌড় দেখার জন্য মামার পিছু ধরতাম, সাথে না নিলে সারাদিন কান্না করতাম। নানার ঘাড়ে চড়ে হাটে যেতাম। নানির রূপকথার গল্প শুনতাম। রাতে কারেন্ট না থাকলে একসাথে সবাই চন্দ্রবিলাস করতাম।

ফিরবে কি সেই দিনগুলো অতীত নামক কারাগার থেকে? আগের মতো কি আর মামার সাথে ঘোরাঘুরি হবে? নানির গল্পের স্বাদ নেওয়া হবে? ভাবনার আকাশে দোলা দেয় সেদিনের স্মৃতিগুলো। অজান্তেই চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে পড়ে।

তাইতো শৈশবের হাতছানিগুলো এখনো আমার মন কাড়ে। এখন স্মৃতিগুলো ভেবে মনে হচ্ছে, ডানা মেলে উড়ে যাই বৃষ্টি জলে ফেলে আসা সেই শৈশবে।

নাফিস ইকবাল নাফি
শিক্ষার্থী, মাদিনাতুল উলুম খুকনি, সিরাজগঞ্জ

অভিমানের হলুদ পোশাক

শিব্বির আহমদ

অভিমানে অভিমানে অতিবাহিত হচ্ছে বর্তমানের সমূহ সময়। ফুসফুস টেনে নিচ্ছি ব্যথার বাতাস সর্বদা। অপ্রাপ্তির হাহাকার থেকে থেকে জেগে ওঠে সকালে, দুপুরে, রাতেও; ভোরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়ও। আজন্ম চ্যাঁচিয়ে বেড়ে ওঠা প্রাণোচ্ছল আমি করি চুপ থাকার পণ। মঙ্গলবার যায়, বুধবার যায়, অনেক ভীষণ কষ্ট হয় তবু বৃহস্পতিবার যায়, শুক্রবার গত হয়ে যাবার শেষ দিকে একটু স্বাভাবিক হই কী মনে করে?

চুপ থাকার রূপে চিন্তায় চ্যাঁচিয়েছি মূলত নিজের সাথে নীরবে, নীল নির্জনে। হৃদয়ের আকাশজুড়ে ভাবনার মেঘমালা উড়ছে কেবল। উড়ছেই। খুব দ্রুত আত্মপায়ের ভরে দাঁড়াবার ও চলার চেষ্টার থেকে কবুল শুনলাম বহু তিনবার, এই চুপ সময়ে এবং শুনছি এখনো। স্বাবলম্বী হওয়ার উচ্চাশার দৌড় দেখলাম বিলিয়নিয়ার পর্যন্ত এবং দ্রুতই সে তক। যোগাযোগকে ঠিক কতটা গুরুত্বে রাখব? কম ভাবিনি এটাও। মায়ার ছায়ায় আয়েশ করলে অতিরিক্ত অনেক যোগাযোগকে তা দিতে হয়, জীবনে তেমন ফলপ্রসূ যা নয়। আবডালে রবো তবে। তা আবার আমার কাছে কষ্টকর চুপ থাকার মতোই। ফোন একটা নেবই, তবে ধরনের প্রতিজ্ঞাকে চুম্বন করি, করি আলিঙ্গনও অবশেষে।

একা এবং একাকীর এ সময়ে কত কী আরও ভেবে ভেবে কখনো দ্বিধা এবং কখনো সিদ্ধান্তে জুতা ত্যাগ করেছি এবং পা নামিয়ে দ্রুত-ধীরে হেঁটেছি আরও অনেক দূর, তার হিসেব অবিলম্বে আকাশে পৌঁছেছে। স্বাপ্নিক ও স্বাভাবিক পূর্বের আমার মতো কি হেসে উঠবো ফোলা গালে? নাকি জীবনের ২০শের দশকেও ছোট থাকার দায়ে অভিমানের হলুদ পোশাক আর খুলব না?

শিক্ষার্থী ও লেখক

‘জীবনের জন্য রোদের তেমনি প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন ছায়ার। রোদ গ্রহণ করো উত্তাপের জন্য, ছায়া গ্রহণ করো সজীবতা অর্জনের জন্য’।

গত (রমজান) সংখ্যায় যারা সেরা লেখক হয়েছেন

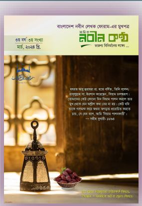

লেখক পুরস্কার

Ramadan Kareem

মাসিক নবীনকণ্ঠ'র মার্চ-২০২৪ সংখ্যায়, যে-চারজন লেখক 'সেরা লেখক' নির্বাচিত হয়েছেন:

১	২	৩	৪
আলী ওসমান শেফায়েত	আবরার নাঈম	দ্বিপ্রহর	হুসাইন আহমদ
প্রবন্ধ	ছড়া	মুক্তগদ্য	ভ্রমণকাহিনি

নির্বাচিত লেখকগণ নবীনকণ্ঠ'র ফেসবুক পেজের ইনবক্সে নক করুন

সহযোগিতায় দৈনিক দেশচিত্র (যেখানে বাঙালি সেখানেই আমরা) TIJARAH ASLI তিজারাহ আসলী

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

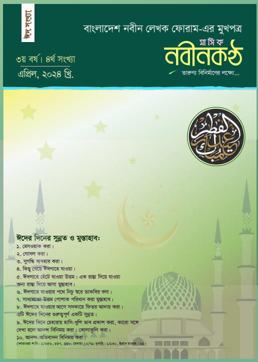

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. প্রকাশনী

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com

যোগাযোগ: 01789204674